Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

শিল্পী : শেখ আফজাল, ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক

প্রথম আলো
বিশেষ ক্রোড়পত্র
বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১ কার্তিক ১৪৩২
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
২০২৫

তারুণ্যের দিগন্ত

তরুণদের সামনে নতুন পৃথিবীর আহ্বান। কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পথে শত বাধা ও বৈষম্যের প্রাচীর। আবার তরুণেরাই সেসব বৈষম্যের বাধা উপড়ে ফেলে এগিয়ে চলে। তরুণদের পথের সেসব বাধা আর বাধা পেরোনোর গল্প নিয়ে এই ক্রোড়পত্র।

ISO 9001 2015 CERTIFIED
BSTI BDS-1878
AB POLY™
uPVC Pipes & Fittings
টিকবে যুগের পর যুগ...

এবি পলি'র মানে বুদ্ধিমানরা জানে

এবি পলি ইউপিভিসি পাইপস অ্যান্ড ফিটিংস **আইএসও সার্টিফাইড, বুয়েট ল্যাব পরীক্ষিত ও বিএসটিআই অনুমোদিত**। যা আপনার স্থাপনায় নিরবচ্ছিন্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং স্থাপনার সাথে পাইপের বন্ধন টিকে যুগের পর যুগ।

Asian AB Polymer Industries Ltd.
info@asianabpolymer.com.bd www.asianabpolymer.com.bd facebook.com/asianabpoly
+88 018 9877 5013
BrandzCooker/2025

MGH

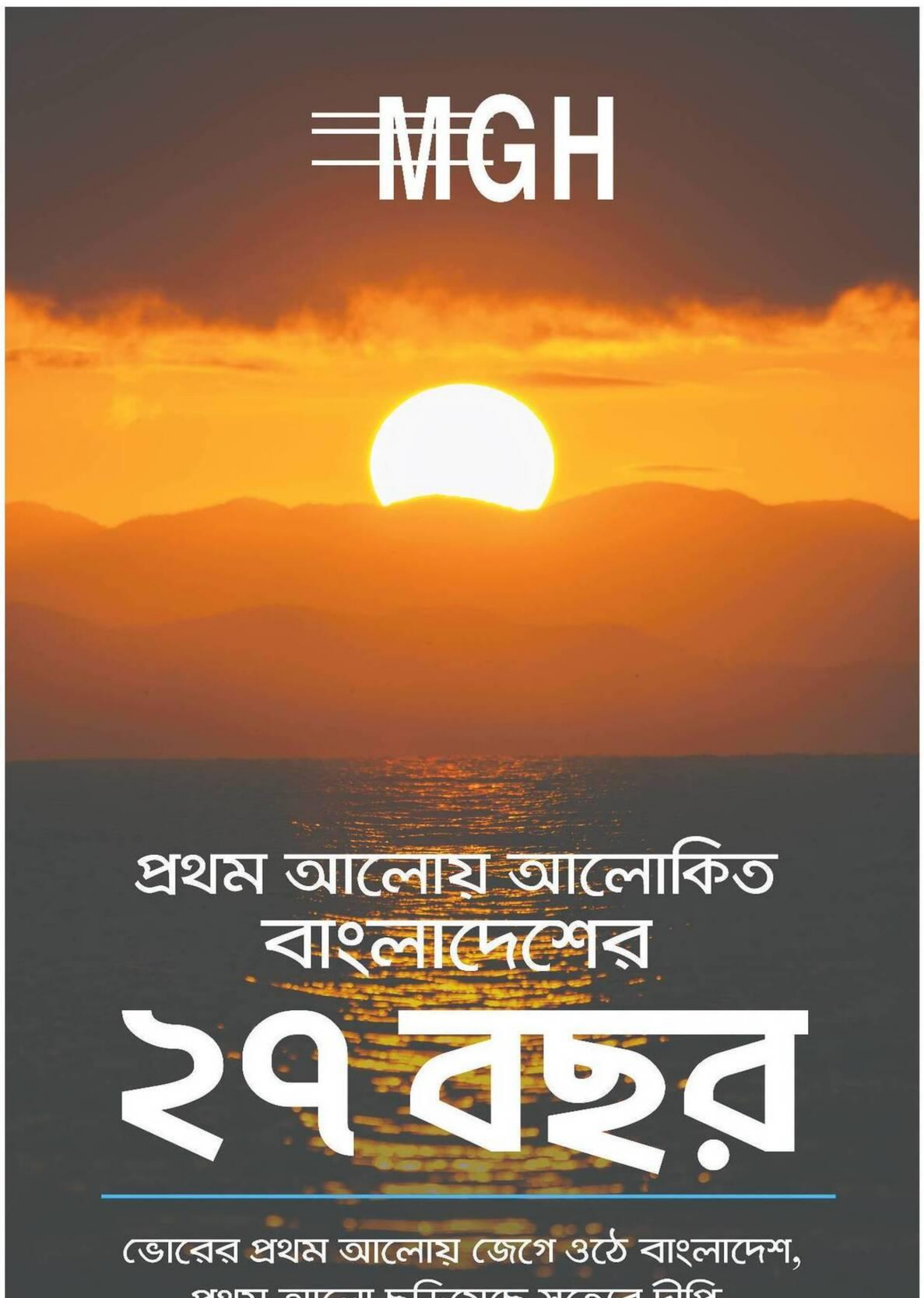

প্রথম আলোয় আলোকিত বাংলাদেশের
২৭ বছর
ভোরের প্রথম আলোয় জেগে ওঠে বাংলাদেশ,
প্রথম আলো ছড়িয়েছে সত্যের দীপ্তি,
জাগিয়েছে প্রেরণা ও আশার আলোকধারা।

সমতার খোঁজে শিক্ষা

শাহীর চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, শিখো

২০২৪ সালে তরুণদের আন্দোলন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সমান সুযোগ আর ন্যায্যতাই আজকের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় দাবি। কোটা সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ন্যায্যতা। কিন্তু এর মূল বার্তা ছিল আরও গভীর। এই প্রজন্ম আর অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে চায় না। তারা এমন এক বাংলাদেশ চায়, যেখানে সুযোগ নির্ভর করবে মেধা, পরিশ্রম ও দক্ষতার ওপর, জন্মপরিচয়ের ওপর নয়। এই তরুণদের শক্তিই আমাদের ভবিষ্যৎ আর সেই ভবিষ্যৎ তখনই টেকসই হবে, যখন শিক্ষাব্যবস্থার ভিত হবে মজবুত।

প্রাচুর্যের বিপরীতে অভাব আর সংগ্রাম

আমরা প্রায়ই বলি, 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। কিন্তু সেই মেরুদণ্ডই যদি বৈষম্যে বাঁকা হয়ে যায়, তাহলে জাতি সোজা হয়ে দাঁড়াবে কীভাবে? বাংলাদেশে আজও শিক্ষার মান, সুযোগ ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জন্মস্থান, আয় আর যোগাযোগব্যবস্থার ওপর। একদিকে শহরের শিশুরা যেমন স্মার্ট বোর্ড আর আধুনিক উপকরণে শিখে এগিয়ে থাকছে, অন্যদিকে সীমিত সম্পদ আর প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকই শহরের বাইরের শিশুদের সহায়। তাই শহরে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, বাইরে তা যায় না, এটাই বাস্তবতা।

এটি কোনো ব্যক্তিগত ত্রুটি নয়, এটি আমাদের নীতিগত ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। আমাদের শিক্ষকেরা পরিশ্রমী ও আন্তরিক; কিন্তু তাঁরা কি একই মানের প্রশিক্ষণ, একই সুযোগ-সুবিধা বা একই ধরনের উপকরণ পান? এক পাশে প্রাচুর্য, অন্য পাশে অভাব আর সংগ্রাম—এই বৈষম্যই আজও বাংলাদেশের শিক্ষায় সবচেয়ে বড় সংকট।

বৈষম্যের গভীরে এক দৃষ্টি

আজ বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৪০ লাখ। দেশের অর্ধেক জনশক্তির বয়স ২৫ বছরের কম; অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৮ কোটি তরুণ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণদের প্রায় ৪০ শতাংশ বর্তমানে কোনো পড়াশোনা, চাকরি বা প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত নয়।

দেশে ৪ কোটি ২০ লাখ শিক্ষার্থী। কিন্তু তাদের জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। কাগজে-কলমে বলা হয়, গড়ে প্রতি ৩৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক আছেন। কিন্তু গ্রামের কিছু স্কুলে গেলে দেখা যায় ভিন্ন ছবি; সেখানে অনেক সময় একজন শিক্ষকের সামনে ৬০টা মুখ, ৬০টা প্রশ্ন, ৬০টা স্বপ্ন।

২০১৮ সালে শুরু হওয়া প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-৪), যার বাজেট ছিল ৩৮ হাজার ২৯১ কোটি টাকা, ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ৬২ শতাংশ। প্রকল্পের কাজ পিছিয়েছে, কিন্তু শিশুদের শেখার সময়টা কি থেমে ছিল?

এক জরিপে দেখা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখনো বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউটরের ওপর নির্ভরশীল। মানসম্মত শিক্ষা এখন শুধু অধিকারের প্রশ্ন নয়, বরং অর্থনৈতিক সামর্থ্যেরও প্রশ্ন। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার শহরের তুলনায় গ্রামে অর্ধেকের কম। ফলে ডিজিটাল কনটেন্ট শহরে মানুষের নাগালে, কিন্তু শহরের বাইরে এখনো অধরা।

সবচেয়ে বড় বৈপরীত্যটি দেখা যায় জাতীয় বাজেটে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মোট ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ৯৫ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা; যা দেশের জিডিপির মাত্র ১ দশমিক ৬ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় এই হার এখনো সবচেয়ে কম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সীমিত অর্থ দিয়ে দেশের ৪ কোটি ২০ লাখ শিক্ষার্থী, প্রায় ১০ লাখ শিক্ষক এবং অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সানোন্নয়ন ও সমতা নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব কি?

সীমিত সম্পদের দেশ, সীমাহীন স্বপ্ন

রাজস্ব আদায় কম হওয়ায় সরকারের ব্যয়ের সক্ষমতাও কম। তাই সরকার চাইলেই হুট করে শিক্ষা বাজেট দ্বিগুণ করতে পারবে না, এটাই বাস্তবতা। তাহলে সমাধান কোথায়?

সমাধান নতুন করে ভাবার মধ্যে। বর্তমান বিশ্বে সীমিত সম্পদে অধিক প্রভাব সৃষ্টির একমাত্র পথ হচ্ছে ডিজিটাল রূপান্তর।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা কেবল অর্থের ঘাটতি নয়, বরং দক্ষতা ও সুযোগের অসম বণ্টন। শহরাঞ্চলে ভালো শিক্ষক পাওয়া গেলেও শহরের বাইরে দৃশ্যপট একেবারেই ভিন্ন। এতে বঞ্চিত হচ্ছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী। প্রযুক্তিই পারে এই ব্যবধান দূর করতে। একটি অনলাইন বা ভিডিও ক্লাস, একটি স্মার্ট ডিভাইস, একটি ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষই পারে একজন ভালো শিক্ষককে সবার কাছে পৌঁছে দিতে।

প্রযুক্তির এই অমিত সম্ভাবনা আর সাফল্যের কথা বলতে গেলে চলে আসে পটুয়াখালীর বাউফলের ছেলে আল আমিনের কথা। তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনের উৎস ছিল বাবার ছোট একটা ব্যবসা। পড়াশোনার পাশাপাশি বাবার সঙ্গে সময় দিতে হতো আল আমিনকে। টাকার অভাবে আলাদা করে কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির কোচিং করতে পারেনি, 'শিখো'ই ছিল তার একমাত্র ভরসার জায়গা।

সারা দেশে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর দেখা গেল, সম্মিলিত মেধাতালিকায় আল আমিন ১১৭তম স্থান অর্জন করেছে। জীবনবদলের নতুন বাঁকে মোড় নিয়ে আল আমিন এখন ভর্তি হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে।

আবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা উত্তর বেদকাশী ইউনিয়নের ছেলে মুশফিক। যেখানে ভালো শিক্ষক পাওয়া কঠিন আর মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ প্রায় অধরাই। এমন এক অঞ্চলে থেকেও মুশফিক প্রমাণ করেছে, স্বপ্নের কোনো ভৌগোলিক সীমা নেই। তার স্কুলের ইতিহাসে আগে কখনো কেউ নটর ডেম কলেজে পড়েনি। কিন্তু মুশফিক সেই ইতিহাস বদলে দিয়েছে। এসএসসিতে জিপিএ-৫ অর্জন করে সে নিজের গ্রাম থেকে সরাসরি পৌঁছে গেছে দেশের অন্যতম সেরা কলেজ নটর ডেমে। তার এই যাত্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল শিখো।

আল আমিন কিংবা মুশফিক, তাদের গল্প শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়; বরং বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের এক স্পষ্ট বার্তা। তারা দেখিয়ে দিয়েছে, প্রযুক্তি, ভালো শিক্ষক ও মানসম্মত কনটেন্ট যদি সবার নাগালে পৌঁছায়, তাহলে দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও নতুন প্রজন্ম অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম।

> আমাদের সামনে এখন দুটি পথ—একটি পুরোনো, যেখানে বৈষম্য আরও বাড়তে থাকবে; আরেকটিতে প্রযুক্তির মাধ্যমে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে অমিত সুযোগ।

ডিজিটাল রূপান্তর মানে শিক্ষার নতুন কাঠামো

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এখন সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন একটি নতুন কাঠামো, যেখানে প্রযুক্তি হবে ভিত্তি, আর মানুষ থাকবে কেন্দ্রে। প্রযুক্তি কোনো বিকল্প নয়; এটি সহায়ক শক্তি, যা শিক্ষককে ক্ষমতায়িত করে, শিক্ষার্থীকে স্বাধীন করে, অভিভাবককে সম্পৃক্ত করে, প্রশাসককে দক্ষ করে আর নীতিনির্ধারককে করে তোলো তথ্যসমৃদ্ধ।

১. পাঠ্যক্রম : প্রযুক্তি পাঠ্যক্রমকে আরও আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক করতে পারে। ডিজিটাল উপকরণ ও অনলাইন রিসোর্সের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা আর্থিক সাক্ষরতার মতো নতুন দক্ষতা পাঠ্যক্রমে সহজে যুক্ত করা যায়। ফলে শেখা হয় শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনের জন্য।

২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ : দেশে ১০ লাখের বেশি শিক্ষক, কিন্তু প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত। অনলাইন প্রশিক্ষণ, মাইক্রো লার্নিং ভিডিও, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ও এআই সহায়ক টুলের মাধ্যমে শিক্ষকেরা নিজেদের সুবিধামতো সময়ে, আপন গতিতে নিজেকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো করে গড়ে তুলতে পারেন। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, শ্রেণিকক্ষ প্রাণবন্ত হয় এবং শিক্ষাদান হয় আরও কার্যকর।

৩. শিক্ষণ উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি এসেছে ভিডিও, অ্যানিমেশন, সিমুলেশন ও গেম-বেজড লার্নিং। এসব ডিজিটাল উপকরণ শেখাকে আনন্দদায়ক করে, আর শিক্ষক পান একটি কার্যকর সহায়ক।

৪. শিক্ষার্থীর ফলাফল : ডিজিটাল মূল্যায়নব্যবস্থার মাধ্যমে শেখার অগ্রগতি তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়। কে কোথায় পিছিয়ে আছে, কার কী সহায়তা দরকার—সবই বোঝা যায় তথ্যের মাধ্যমে। ফলে পুরো ব্যবস্থা হয় তথ্যভিত্তিক ও ক্রমাগত উন্নয়নশীল।

শিক্ষাপ্রযুক্তির সৌন্দর্য এখানেই। এটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত এক কাঠামো। শিক্ষার্থী শেখে, শিক্ষক অনুপ্রাণিত হন, অভিভাবক বুঝতে পারেন, প্রশাসন পরিকল্পনা করে আর নীতিনির্ধারকেরা জানেন কোথায় বিনিয়োগ করলে সর্বাধিক ফল মিলবে।

ইন্টারনেট মানে বিলাসিতা নয়, মৌলিক অধিকার

আমাদের দেশে এখনো ইন্টারনেটকে অনেকেই বিলাসিতা মনে করেন। অথচ আজকের পৃথিবীতে এটি বিদ্যুৎ বা পানির মতোই অপরিহার্য।

ভারতে ২০১৬ সালে রিলায়েন্স জিও ডেটার দাম কমিয়ে ইন্টারনেট সবার নাগালের মধ্যে নিয়ে আসে। সেই সিদ্ধান্তেই তারা অনলাইন শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য আর কর্মসংস্থানে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। সাহসী নীতিগত সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশেও তা সম্ভব।

মোবাইল ডেটায় অতিরিক্ত কর, ফোন উৎপাদনে বাড়তি ভ্যাট—এসব কমাতে হবে। দেশের যেসব অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল, সেসব অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

এ ছাড়া শিক্ষাপ্রযুক্তিতে তৈরি সফটওয়্যার ও ডিজিটাল টুলগুলো দেশীয় বিশেষজ্ঞদের হাতে তৈরি হওয়া জরুরি; যারা পাঠ্যক্রম, ভাষা ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত জানেন এবং বোঝেন।

যেভাবে বিদ্যুৎ না থাকলে একটি গ্রাম অন্ধকারে থাকে, ঠিক তেমনই ইন্টারনেট ছাড়া একটি অঞ্চল বঞ্চিত থাকে উন্নয়নের আলো থেকে। সাশ্রয়ী ইন্টারনেটই এই বৈষম্যের দেয়াল ভাঙতে পারে।

অর্থনীতি ও আশার সমীকরণ শিক্ষাসংস্কার মানে শুধু পাঠ্যক্রম পরিবর্তন বা সংস্কার নয়, এটি অর্থনীতিরও সংস্কার। যদি সারাদেশের স্কুলে স্কুলে ডিজিটাল সংযোগ দেওয়া যায়, এটি হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা-সংযুক্ত কর্মসংস্থান কর্মসূচি।

একইভাবে ১০ লাখ শিক্ষক যদি প্রযুক্তি-সহায়ক টুল ব্যবহার করে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ ঘণ্টা সময় সাশ্রয় করতে পারেন, তাহলে বছরে প্রায় ৫ কোটি ঘণ্টা নতুনভাবে শিক্ষার্থীর শেখানোর কাজে ব্যয় করা সম্ভব। এক গবেষণা বলছে, ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক-ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছরে দেড় থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত জিডিপি বাড়ানো সম্ভব। তাই শিক্ষাসংস্কার শুধু মানবিক উদ্যোগ নয়, এটি একটি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতিও।

এক নতুন চুক্তির সময়

বাংলাদেশ এখন এমন এক বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে শিক্ষা শুধু ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নয়, এটাই ভবিষ্যৎ।

আমাদের সামনে এখন দুটি পথ—একটি পুরোনো, যেখানে বৈষম্য আরও বাড়তে থাকবে; আরেকটি নতুন পথ, যেখানে প্রযুক্তির মাধ্যমে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে অমিত সুযোগ।

আমাদের প্রয়োজন এক নতুন সামাজিক চুক্তি, যেখানে শিক্ষা সবার, প্রযুক্তি সবার, ভবিষ্যৎও সবার। প্রযুক্তি হবে সমতার হাতিয়ার, আর শিক্ষা হবে আগামী প্রজন্মের শক্তির উৎস।

যেদিন দেশের প্রতিটি স্কুলের শ্রেণিকক্ষে থাকবে টেলিভিশনের পর্দা, প্রত্যেক শিক্ষক পাবেন নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা।

আসি বিশ্বাস করি, যেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর শেখা তার জন্মস্থানের ওপর নির্ভর করবে না, সেদিনই আমরা অর্জন করব জ্ঞান ও সুযোগের প্রকৃত স্বাধীনতা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার হালচাল

প্রাথমিক		মাধ্যমিক
১,১৮,৬০৭	মোট বিদ্যালয়	১৮,৯৬৮
২,০১,৮৩,০৪৮	মোট শিক্ষার্থী	৮১,৬৬,১৮৮
৭,০৭,২১৬	মোট শিক্ষক	২,৪৬,৭৮৪
১ : ২৮	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	১ : ৩৩
৯২%	গাইড বইয়ে নির্ভরশীল	৯৩%

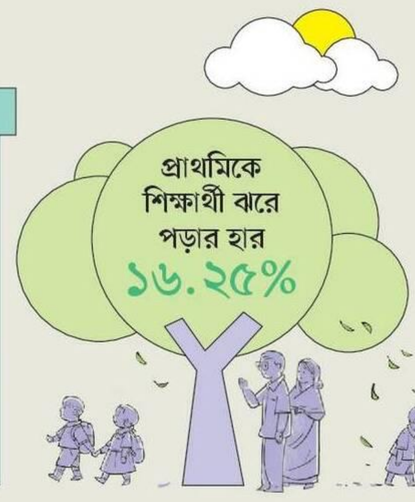

দেশে দেশে জিডিপি থেকে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ

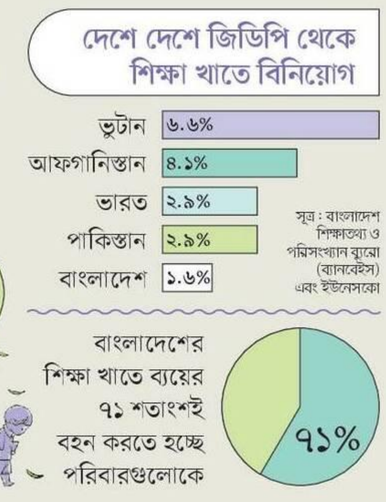

WSBI | ব্যাংক এশিয়া

টেকসই উন্নয়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ব্যাংক এশিয়ার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

ওয়াসিংটন ডিসি-তে World Savings and Retail Banking Institute (WSBI) কর্তৃক প্রদত্ত WSBI SDG-2025 অর্জন

এ অর্জন টেকসই ও উদ্ভাবনী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে
অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে
ব্যাংকের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

শিশু-কিশোরদের কণ্ঠ অশ্রুত রয়ে যায়

নিশাত সুলতানা

লেখক ও
উন্নয়নকর্মী

দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি শিশুর অধিকার নিয়ে। তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়—সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিশুদের সাহচর্য পাওয়ার অনন্য অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। শিশুদের সান্নিধ্য যে পবিত্রতা আর সরলতায় আমাকে উদ্ভাসিত করেছে, ওদের ভাবনাগুলো যেভাবে ঋদ্ধ করেছে, বড়দের ক্ষেত্রে সে রকম হয়নি। শিশুদের ভাবনায় যে নিষ্কলুষতা আর সরলতার সন্ধান পেয়েছি, তা যদি বড়দের মধ্যে থাকত তাহলে নিশ্চয়ই এত দিনে এই পৃথিবী স্বর্গভূমিতে পরিণত হতো। কিন্তু শিশুসনের সেসব ভাবনা শুনবে, তেমন মানুষ এই জগতে কোথায়!

আমার কেবলই মনে হয়, শিশুদের 'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম' হিসেবে আখ্যা দিয়ে আমরা হয়তো ওদের বর্তমান অস্তিত্ব আর ওদের চাওয়া-পাওয়াগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমরা বড়রা স্বার্থপরের মতো ধরেই নিয়েছি, শিশুরা কী এমন জানে! কীই-বা বলার আছে ওদের! আমরা চেয়েছি শিশুরা ঠিক ততটুকুই বলবে, যতটুকু আমরা বড়রা শুনতে চাইব।

শিশুর সংজ্ঞা কী

প্রায় ৫৫ বছর হতে চলল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে বিস্ময়কর হলো, স্বাধীনতার ৫৫ বছরেও এই রাষ্ট্র 'শিশু'র সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোনো সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ দেশে প্রচলিত আছে নানা আইন ও নীতিমালা। কিন্তু এসব আইন ও নীতিমালায় শিশুর বয়স-সংক্রান্ত সমন্বয়হীন ব্যাখ্যা শিশুর সংজ্ঞাকে বিভ্রান্ত করেছে বারবার।

শিশুর সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিশুর জন্য সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা। শিশু আইন ২০১৩-এর ৩-এর ধারা ৪-এ বলা হয়েছে, 'বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হইবে।'

কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রচলিত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় শিশুর বয়স-সংক্রান্ত সারপ্যাঁচ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার না আসায় শিশুর সংজ্ঞা ও বয়স নির্ধারণে দেখা দিচ্ছে নানা বিভ্রান্তি ও জটিলতা। শিশু বঞ্চিত হচ্ছে তার অধিকার থেকে।

শিশুর সংজ্ঞা এবং বয়স সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারিনি বলেই হয়তো আমাদের জানা নেই এ দেশে ১৮ বছরের কম বয়সী নাগরিকদের প্রকৃত সংখ্যা কত। জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ অনুযায়ী, দেশে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা ৪ কোটি ৮৯ লাখের বেশি, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৯ শতাংশ।

অন্যদিকে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী নাগরিকের সংখ্যা ৩ কোটি ১৫ লাখ ৬১ হাজার ৮১১, যা মোট জনসংখ্যার ১৯ দশমিক ১১ শতাংশ। অর্থাৎ শিশু আইনে উল্লিখিত শিশুর সংজ্ঞা অনুযায়ী, দেশের মোট শিশুর সংখ্যা বের করতে হলে কাগজ-কলম সঙ্গে নিয়ে জটিল হিসাব-নিকাশে বসতে হবে। তবে বলা হয়, দেশের মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৪০ শতাংশ শিশু। সে হিসাবে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী নাগরিকের সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটির বেশি।

কেমন আছে শিশুরা

প্রশ্ন হলো, কেমন আছে বাংলাদেশের এই সাড়ে ছয় কোটি শিশু? ওদের অবস্থা বোঝার জন্য যদিও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দিকে চোখ রাখাই যথেষ্ট, তবু সাম্প্রতিক কিছু তথ্য-উপাত্তের সাহায্য নেওয়া যেতেই পারে।

বাল্যবিবাহ আজও এ দেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক নম্বর সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। দেশের মোট শিশুর অর্ধেক মেয়ে। এই মেয়েশিশুদের আবার অর্ধেকই বাল্যবিবাহের হুমকির মুখে জীবন অতিবাহিত করছে।

> এই রাষ্ট্র আজও 'শিশু'র সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোনো সংজ্ঞা দিতে পারেনি। আইন ও নীতিমালায় শিশুর বয়স-সংক্রান্ত সমন্বয়হীন ব্যাখ্যা শিশুর সংজ্ঞাকে বিভ্রান্ত করছে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, এমনকি যুগের পর যুগ চলে যায়; কিন্তু কিছুতেই কমে না বাল্যবিবাহ। গত মার্চ মাসে প্রকাশিত ইউনিসেফ, ইউএন উইমেন এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের 'গার্লস গোলস : হোয়াট হ্যাজ চেঞ্জড ফর গার্লস? অ্যাডলেসেন্ট গার্লস রাইটস ওভার থার্টি ইয়ার্স' শীর্ষক যৌথ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৫১ দশমিক ৪ শতাংশেরই বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর হওয়ার আগে।

গ্লোবাল হাঙ্গার রিপোর্ট বা বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ২০২৪-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১১ দশমিক ৯ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। অপুষ্টি মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলছে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে। অন্যদিকে ২০২২ সালে ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শ্রমের হার ছিল প্রায় ৮ দশমিক ৯ শতাংশ, যা প্রায় ৩৫ লাখ শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এর মধ্যে প্রায় ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু আবার ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। শিশুদের জন্য নেই পর্যাপ্ত খেলার মাঠ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তথ্যমতে, মেগা সিটি ঢাকায় জনসংখ্যার অনুপাতে অন্তত ১ হাজার ৩০০ খেলার মাঠের প্রয়োজন, যেখানে আছে মাত্র ২৩৫টি। খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শিশুরা হাতে তুলে নিচ্ছে মুঠোফোন-ট্যাবের মতো যন্ত্র। কিন্তু সেখানেও জাল বিস্তার করে রেখেছে সাইবার অপরাধীরা।

২০২৩ সালে প্রকাশিত সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়্যারনেস ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাইবার অপরাধ ভুক্তভোগীদের মধ্যে ১৪ দশমিক ৮২ শতাংশের বয়সই ১৮ বছরের কম।

অপরিকল্পিত নগরে উন্মুক্ত ম্যানহোল, দখল হয়ে যাওয়া ফুটপাত, বখাটের আতঙ্ক, যানজট আর খানাখন্দে ভরা রাস্তার মধ্য দিয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন পথ চলে এ দেশের শিশুরা। ব্যস্ত রাস্তায় কোনো কারণে শিশুর হাত একবার মা-বাবার হাত থেকে ছুটে গেলে সেই শিশু আর কখনো মায়ের কোল ফিরে পাবে, তেমন নিশ্চয়তা নেই এ দেশে।

শিশুদের কাঁধে বইয়ের বোঝা বেড়েছে, বাড়েনি শিক্ষার গুণগত মান। বইয়ের ভারে শিশুর শরীর নুয়ে পড়ছে, কিন্তু শিক্ষাক্রম আর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিতর্ক থামেনি। পরীক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুও এ দেশে রাজনীতির অংশ। শিশুরা বোঝে না, কী অদ্ভুত কলাকৌশলে তাদের উপজীব্য করে শিক্ষা-বাণিজ্য আর রাজনীতি চলে এই দেশে।

সাম্প্রতিক সময়ে শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা মাত্রা ছাড়িয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম সাত মাসেই ৩০৬ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৭৫ শতাংশ বেশি। এই শিশুদের মধ্যে ৪৯ জনের বয়স ৬ বছরের মধ্যে এবং অন্যরা ৭ থেকে ১৭ বছর বয়সী। শিশুর প্রতি নির্যাতনের এই ভয়াবহতা স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো। প্রকাশের বাইরে থেকে যায় হাজারো সহিংসতার গল্প। নিজের ঘরটি পর্যন্ত শিশুর জন্য নিরাপদ নয়।

আর কতকাল শিশুরা বঞ্চিত থাকবে

শিশুরা উদার বলেই হয়তো রাষ্ট্রকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করায় না। ওরা জানতে চায় না কেন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে শিশুরা উপেক্ষিত থাকবে কিংবা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? কেন রাষ্ট্র শিশুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ এই দেশে? যুগের পর যুগ কেন আইন শুধু বাক্সবন্দী থাকবে? কেন ওরা মুক্ত পরিবেশে খেলতে পারবে না, চলতে পারবে না, নির্ভয়ে নিজের অনুভূতিটুকু প্রকাশ করতে পারবে না? কী অপরাধ ওদের?

কিছুদিন আগে জাতীয় শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টাকে শিশুদের উদ্দেশে বলতে শুনেছিলাম, 'তোমরা যেকোনো সমস্যায় সরাসরি মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করবে।'

প্রশ্ন হলো, আমরা বড়রাই যেখানে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হিমশিম খাই, সেখানে শিশুদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা? শুধু কথার জন্য কথা আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির চমকে আর কতকাল আমরা বঞ্চিত করব শিশুদের?

ভাবতে অবাক লাগে, সাড়ে ছয় কোটি শিশুর এই দেশে শিশুদের জন্য নেই পৃথক কোনো অধিদপ্তর। এ দেশে আছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তরসহ কত রকমের অধিদপ্তর! এমনকি আছে মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। কিন্তু ৪০ শতাংশ শিশুর এই দেশে শিশুদের অধিকারকে পৃথকভাবে দেখভাল করার জন্য নেই আলাদা কোনো অধিদপ্তর।

বর্তমানে ২০টির বেশি মন্ত্রণালয় শিশু উন্নয়ন ও অধিকার নিয়ে কাজ করছে। এসব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে নেই সমন্বিত পরিকল্পনা, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও তার বাস্তবায়ন। শিশুদের অধিদপ্তরের প্রসঙ্গটি এলেই বারবার সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়। অথচ শিশুদের জন্য বিনিয়োগ রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

আমরা জানি, শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করলে এর সুফল কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বাংলাদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়, অথচ দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ শিশুদের জন্য বিনিয়োগের দাবিটি বারবার উপেক্ষিত হয়।

দেশের শক্তিশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রটি হলো শিশু। শিশুর সঠিক বিকাশ ও তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলার অর্থ হলো দেশের ভিত্তিকে মজবুত করে গড়ে তোলা। অথচ সেই মজবুত ভিত্তি স্থাপনের বিষয়টিই উপেক্ষিত থেকে যায় বারবার।

আসুন, শিশুদের শুধু ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচনা না করে তাদের বর্তমান অস্তিত্বকে মেনে নিই এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিই। আমাদের শুনতে হবে শিশুদের কথা, তাদের অনুভব করতে হবে, বুঝতে হবে তাদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। শিশুরা ভালো না থাকলে ভালো থাকব না আমরা। শিশুরা সঠিকভাবে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি না হলে বাঁচবে না বাংলাদেশ।

শিশুদের কণ্ঠ রোধ করে নয়, বরং তাদের কণ্ঠ চারদিকে ছড়িয়ে নির্মাণ করি আগামীর বাংলাদেশ; যে বাংলাদেশে শিশুরা আগন্তুক হিসেবে বিবেচিত হবে না। বরং সেই বাংলাদেশ হবে শিশুদের জন্য, শিশুদের নেতৃত্বে ও তাদের নির্মাণে গড়া নতুন এক বাংলাদেশ।

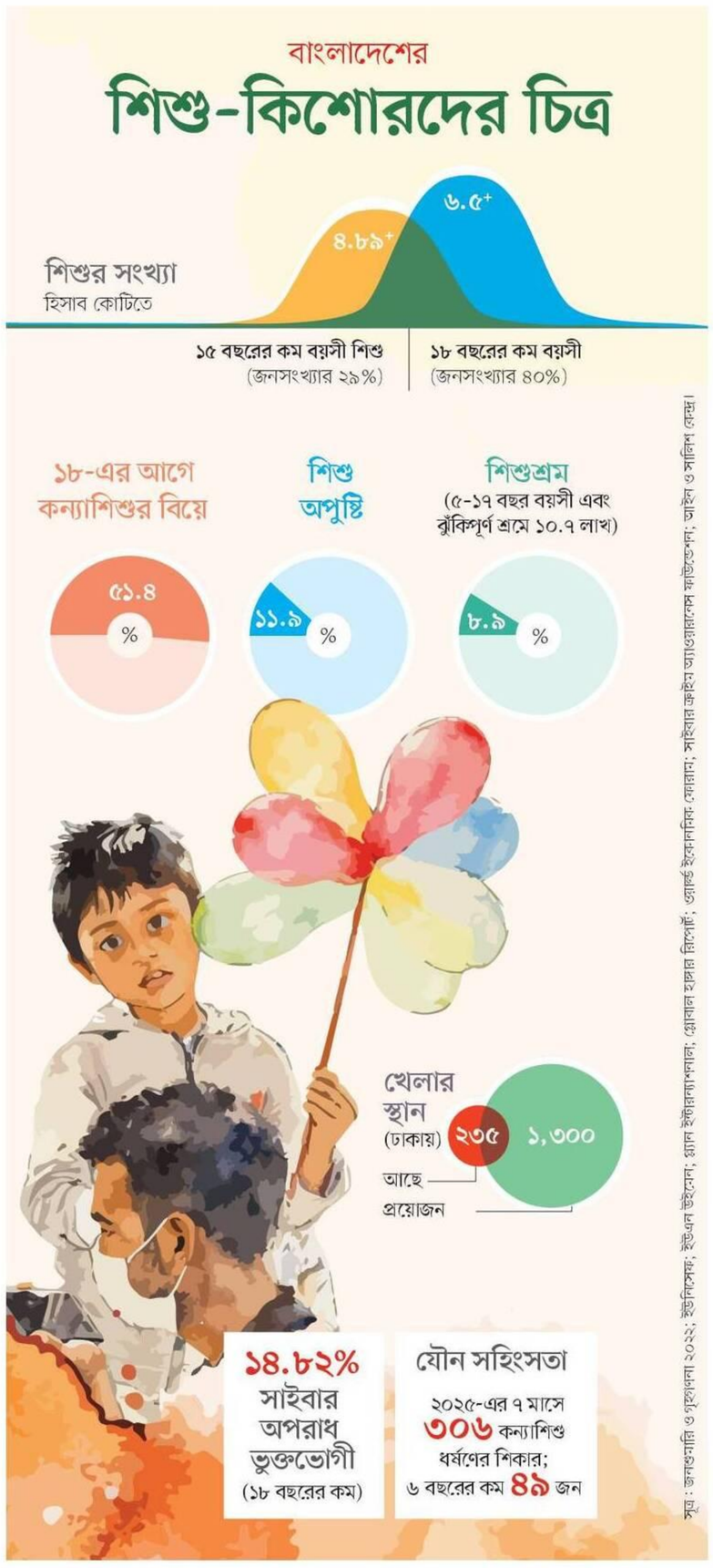

Trust SME BANKING tailored business solution

Trust Bank PLC.
A Bank for Financial Inclusion

ট্রাস্ট নন্দিনী
নারী উদ্যোক্তার স্বপ্নপূরণের সহযোগী

নিজের স্বপ্নটা বাস্তবে রূপ দিতে, আজকের নারী-পরিবার ও সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সফলতার পথে। আর সেই স্বপ্নপূরণে তাদের পাশে আছে ট্রাস্ট ব্যাংকের বিশেষ নারী উদ্যোক্তা সহায়তা প্রকল্প- **ট্রাস্ট নন্দিনী**।

- সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ বা বিনিয়োগ
- বিশেষ সুদের হার (বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল)
- বয়সসীমা ২০ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ বছর
- লোনের মেয়াদ ৫ বছর
- সহজ পরিশোধ পদ্ধতি- এককালীন ও মাসিক কিস্তি

শর্তাবলি প্রযোজ্য

বিস্তারিত জানতে
কল বা স্ক্যান করুন

১৬২০১

/TrustBankLtdBD www.tblbd.com

Eastern Bank PLC.

ইবিএল
দেশের সর্বাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যাংক

Asiamoney Awards

IFC Awards

Euromoney Awards

The Banker Awards

Superbrands Award

Visa Leadership Conclave Awards

Mastercard Excellence Awards

Sustainability Rating Recognition by Bangladesh Bank

e-Commerce Movers Award (eCMA)

Best Climate Focus Bank

Bangladesh FinTech Award

Digital CX Award

ICSB National Award for Corporate Governance Excellence

ICMAB Best Corporate Award

ADB Award

Highest Taxpayer Award

EBL 24X7 CONTACT CENTER 16230 or 09677716230
ebl.com.bd
myebl

চা-বাগানের সীমানা পেরিয়ে

প্রিয়াংকা গোয়ালা

প্রাক্তন শিক্ষার্থী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন

চা-বাগানের শিশুদের অনেকে কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে পঞ্চম শ্রেণি পাস করলেও মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। ছবি : আনিস মাহমুদ

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভাড়াউড়া চা-বাগান। এই চা-বাগানেই আমি বড় হয়েছি। বাবা চা-শ্রমিক, রোজ ভোরে কাজে যেতেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করতেন। দিন শেষে মজুরি পেতেন মাত্র ১০২ টাকা। সেই টাকায় চলত পাঁচজনের সংসার। কিন্তু বাবা কখনো অভিযোগ করেননি। তিনি বলতেন, 'জীবন যত কঠিনই হোক, মা, হাল ছেড়ো না।' বাবার কথাটা আজও আমার ভেতরের শক্তি হয়ে আছে। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা পড়াশোনায় বাধা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করেছি।

জীবন আমাদের প্রতিদিন কিছু না কিছু শেখায়। কেউ শেখে বইয়ের পাতায় চোখ রেখে, কেউ শেখে হেঁটে চলা জীবনের পথ থেকে। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিকারের শিক্ষা আসে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। যখন আমরা হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই, আবার উঠে দাঁড়াই, তখনই শেখা শুরু হয়। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিলাম। তবু মনে প্রশ্ন জাগত, আমার স্বপ্ন কি সত্যিই একদিন পূরণ হবে?

স্বপ্নের পথে প্রথম বৈষম্য

চা-বাগানে মেয়েদের নিয়ে সবার একটা ধারণা থাকে, ওরা কতটুকুই-বা পড়াশোনা করবে! ছোটবেলা থেকেই এ ধরনের কথা শুনেছি। কষ্ট হতো, কিন্তু থামিনি। মনে মনে বলতাম, 'আমি পারব।'

> কখনো মানুষ উপহাস করেছে, কখনো নিজের ক্ষমতার ওপরেই সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু প্রতিবারই ভেতরের একটা মৃদু কণ্ঠ বলেছে, 'এগিয়ে চলো, হাল ছেড়ো না।'

বাবার কষ্ট দেখেই নিজের মধ্যে শক্তি পেয়েছি। স্কুলের পর টিউশন পড়াতাম, যাতে নিজের পড়ার খরচ কিছুটা নিজেই জোগাতে পারি। কখনো কখনো এমন দিন গেছে, দুপুরে শুধু রুটি খেয়েছি। তবু মনে শান্তি ছিল। কারণ, জানতাম, আমি চেষ্টা করছি, সামনে এগোচ্ছি। সেসব দিন আমাকে শিখিয়েছে, সফলতা মানে শুধু বড় কিছু পাওয়া নয়, বরং ছোট ছোট অর্জনগুলোকে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞ থাকা। স্কুল ও কলেজে ভালো ফলাফল করলেও আমার সবচেয়ে বড় লড়াইটা ছিল নিজের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখা। পরিবার তখনো ভাবত, মেয়েদের জন্য পড়াশোনা এতটা দরকারি নয়।

নিজের বিয়ে ঠেকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলেজে ভর্তি হওয়ার পরপরই আত্মীয়রা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য মা-বাবাকে বোঝাতে থাকেন। মা-বাবাও ভাবছিলেন, মেয়ের এত পড়াশোনার কী দরকার? এর চেয়ে সংসার করা ভালো।

আমি ভয় পেয়ে যেতাম। মনে হতো, স্বপ্নটা হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে! রাতে ঘুমাতে পারতাম না, সংসারের ভেতর ঢুকে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু ভেতর থেকে একটা শক্তি বলেছিল, 'না, আমি থামব না।'

একদিন ঠিক করি, নিজেকেই নিজের লড়াইটা লড়তে হবে। বিয়েতে 'না' বলি। আর এটা বলামাত্র আত্মীয়স্বজন আমাকে আর আমার পরিবারকে ভয় দেখাতে শুরু করে, অপমান করে। এমনকি বাড়ির চারপাশে পেট্রল ঢেলে আমাদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছিল!

সেদিন খুব ভয় পেলেও আরও শক্ত হয়েছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি পড়ব, যে করেই হোক। নিজের আর নিজের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। তাই নীরবে শুরু করি নিজেকে রক্ষা করার সংগ্রাম। গোপনে আবেদন করতে থাকি। চট্টগ্রামের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে (এইউডব্লিউ) চা-বাগান অঞ্চলের মেয়েদের বিশেষ বৃত্তি নিয়ে পড়ার আবেদন করি। পেয়েও যাই পূর্ণ বৃত্তি। খবরটা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, এত দিনের কষ্ট যেন একমুহূর্তে সার্থক হয়ে গেছে।

এ ছাড়া প্রথম আলো ট্রাস্ট ও আইডিএলসি আমাকে অদ্বিতীয়া বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করে। এই সুযোগ আমাকে শুধু অর্থনৈতিক সহায়তা দেয়নি, বরং আমাকে আত্মবিশ্বাসী হতে, পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এবং জীবনের লক্ষ্যগুলো আরও সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে নিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

সাফল্যের সিঁড়ি

এইউডব্লিউ থেকে আমি জনস্বাস্থ্যে স্নাতক করেছি। ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবিয়িংয়ে করেছি ইন্টার্নশিপ। পরিবারের খরচ চালাতে ব্রাদার্স ফার্নিচার লিমিটেডে কমিউনিটি সেলস অফিসার হিসেবে কাজ করছি।

চা-শ্রমিক মা-বাবার মেয়ে হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি, ইংরেজিতে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, গবেষণা করছি—এসব ভাবলে আজও অবাক হই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন ভর্তি নিশ্চিত হলো, সেদিন রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু কেঁদেছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি পেরেছি; চা-বাগানের মেয়ে হয়েও আমি নিজের ভাগ্য বদলাতে পেরেছি। স্নাতক শেষ করার দিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিনগুলোর একটি। মা চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, 'তুই সত্যিই পারলি, মা!'

বাবার মুখে সেই গর্বের হাসি দেখে মনে হয়েছিল, এই পৃথিবীর সব ক্লান্তি মুছে গেছে। সেই দিনটি আমাকে নতুন করে শিখিয়েছিল, যত বড় বাধাই আসুক, বিশ্বাস আর পরিশ্রম থাকলে স্বপ্ন একদিন সত্যি হবেই।

বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হবে

চা-বাগানের মেয়ে হয়ে এই পথটা আমার জন্য সহজ ছিল না। এই পথে ছিল কাঁটা, ছিল চোখের জল, ছিল না-বলা কষ্ট। কখনো মানুষ উপহাস করেছে, কখনো নিজের ক্ষমতার ওপরেই সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু প্রতিবারই ভেতরের একটা মৃদু কণ্ঠ বলেছে, 'এগিয়ে চলো, হাল ছেড়ো না।'

আজ যখন পেছন ফিরে তাকাই, দেখি, প্রতিটি কষ্টই ছিল প্রয়োজনীয়। কারণ, সেসব কষ্টই আমাকে আজকের আমিতে পরিণত করেছে।

যে স্বপ্ন দেখি

আমার গল্পটা শুধু আমার নয়; এটা হাজারো মেয়ের গল্প, যারা এখনো কোথাও না কোথাও নিজেদের স্বপ্ন নিয়ে লড়ছে। আমি চাই তারা যেন জানে, চা-বাগান, পাহাড়, গ্রাম বা দারিদ্র্য—কোনো কিছুই তোমার স্বপ্ন থামাতে পারবে না। আমি পেরেছি, তোমরাও পারবে। কখনো নিজের স্বপ্ন নিয়ে লজ্জা পেয়ো না। মানুষ হাসবে, কথা বলবে, কিন্তু তোমাকে থামলে চলবে না। বিশ্বাস রেখো নিজের ওপর, সাহস নিয়ে এগিয়ে চলো। পড়াশোনা চালিয়ে যাও; কারণ, শিক্ষা তোমার মুক্তির চাবিকাঠি।

আমি চাই প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিটি মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক। যেন তারা নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, নিজের মতো করে জীবন গড়তে পারে। শিক্ষা শুধু জীবনে পরিবর্তন আনে না, নিজের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন চা-বাগানের সব মেয়ে স্কুলে যাবে, বই হাতে নেবে, নতুন ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে। তারা জানবে, তারা শুধু শ্রমিকের সন্তান নয়, তারা ভবিষ্যতের নেতা, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মীও হতে পারে।

আন্তরিক সেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে
আমরা আছি আপনার পাশে
www.sjiblbd.com
২৪/৭ কল সেন্টার ১৬৩০২

প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার যে কোন অংক আমানত রেখে বিভিন্ন মেয়াদে অর্জন করুন এককালীন বৃহৎ অংকের টাকা আর নিশ্চিত করুন ইসলামী শরীয়াহ্ সম্মত পরিকল্পিত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ।

১ লক্ষ টাকা ১ বছর থেকে ৩ বছর মেয়াদে জমা করে প্রতি মাসে উপার্জন করুন সর্বোচ্চ ৭২৫ টাকা (প্রাক্কলিত মুনাফা)। ন্যূনতম ১০০,০০০ টাকা বা এর গুণিতক যে কোন পরিমাণ অর্থ জমা রাখা যাবে।

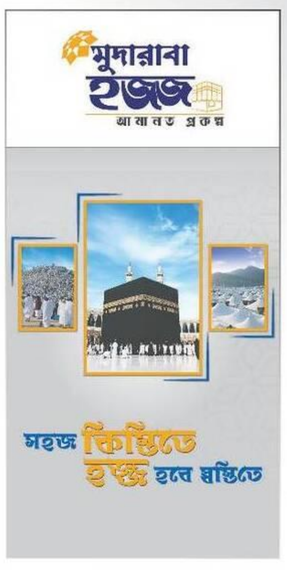

১ থেকে ১০ বছর মেয়াদে ৫,০০০ টাকা থেকে ৪৮,০০০ টাকা হারে মাসিক কিস্তি জমা করে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করুন (প্রাক্কলিত)।

৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি সঞ্চয়ী হিসাব। সর্বনিম্ন ১০০/- টাকা দিয়ে এই একাউন্ট খোলা যাবে। প্রতিদিনের স্থিতির উপর প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রদান ও অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে মুনাফা পরিশোধযোগ্য।

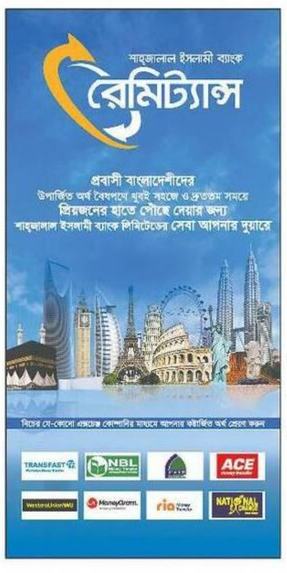

অভিবাসী'র কষ্টার্জিত অর্থ বৈধ পথে অত্যন্ত দ্রুত ও সহজেই বাংলাদেশে মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর জন্য শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক-এর রয়েছে রেমিট্যান্স সেবা।

ইএমভি চিপ ভিত্তিক ও নিরাপদ ডুয়েল কারেন্সির ক্রেডিট কার্ড। রিয়েল টাইম ট্রানজেকশন অ্যালার্ট, ফ্রি মাসিক ই-স্টেটমেন্ট সুবিধা, প্লাটিনাম কার্ডহোল্ডাদের জন্য বলাকা লাউঞ্জের সব সুবিধা গ্রহণের সুযোগসহ নানান সুবিধাসমূহ।

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.
আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

কথাপ্রকাশ

KATHAPROKASH

৩য় পর্ব

নতুন বই : অভিনব কলতান

৫১. হাশেম খান
অমূল্য কথা গল্প যথা (উদ্ধৃতি সংকলন)
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০

৫২. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
ছড়ার রবীন্দ্রনাথ (গবেষণা) [মুদ্রিত মূল্য: ৮০০]

৫৩. সংকলন ও সম্পাদনা সোহানুজ্জামান
শহীদুর রহমান রচনাবলি [মুদ্রিত মূল্য: ৬৫০]

৫৪. জোসেফ ক্যাম্পবেল
মিথের রূপান্তর (মিথ)
অনুবাদ আমিনুল ইসলাম ভুইয়া
মুদ্রিত মূল্য: ৬০০

৫৫. সুভাষ পালেকার
প্রাকৃতিক কৃষির দর্শন (গবেষণা)
অনুবাদ ও সম্পাদনা মো. ইফতেখার আলী
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০

৫৬. সাইম রানা
সংগীতালোকের পথে (সংগীত)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০

৫৭. তারেক আজিজ
অতীত ঢাকার আরও ইতিহাস: জাদুঘর থেকে জাদুকর (ইতিহাস)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০

৫৮. রিদওয়ান আক্রাম
পুনশ্চ ঢাকা: চারশ বছরের ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি (ইতিহাস)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০

৫৯. আহমাদ মোস্তফা কামাল
জীবন ও জগৎ নিয়ে মরমি ও দার্শনিক চিন্তার যৎসামান্য (মুক্তগদ্য) [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০]

৬০. সুমন সাজ্জাদ
বাংলাদেশের সাহিত্য : ইতিহাস ও আত্মপরিচয় (সাহিত্য সমালোচনা)
মুদ্রিত মূল্য: ৮০০

৬১. মোহাম্মদ হাননান
বাঙালি মুসলমানের হজযাত্রা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও আদি চালচিত্র (ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব)
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০

৬২. কে এম মহিউদ্দিন
সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি: সংবিধান-প্রথা-বাস্তবতা (শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি)
মুদ্রিত মূল্য: ৫৫০

৬৩. মো. সফিকুল ইসলাম
বাংলার গৌরব বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম (গবেষণা) [মুদ্রিত মূল্য: ৪০০

৬৪. কামরুল ইসলাম
বিশ্বসাহিত্যের বারান্দায় (সাহিত্য গবেষণা)
মুদ্রিত মূল্য: ৫০০

৬৫. সংকলন ও সম্পাদনা মানবর্দ্ধন পাল
বাংলার বিপ্লবী চরিতাভিধান (অভিধান)
মুদ্রিত মূল্য: ১৫০০

৬৬. মাহরীন ফেরদৌস
চাঁদ দেখা মানুষেরা (উপন্যাসিকা) [মুদ্রিত মূল্য: ৩০০]

৬৭. মোস্তাফিজ কারিগর
সাদা হাতির ঘের (গল্প) [মুদ্রিত মূল্য: ৩৫০]

৬৮. সুজন বড়ুয়া
স্বপ্ন মরীচিকা (গল্প) [মুদ্রিত মূল্য: ৩৫০]

৬৯. গাজী সাইফুল ইসলাম
দর্শন বিশ্ববিদ্যালয় (উপন্যাস) [মুদ্রিত মূল্য: ৮০০]

৭০. সংগ্রহ ও সম্পাদনা অশোক বিশ্বাস
খ্যাতিমানদের রঙ্গরসিকতা (রম্যরচনা)
মুদ্রিত মূল্য: ৭০০

৭১. জফির সেতু
সিলভিয়া প্লাথ: সৃষ্টি ও স্বীকারোক্তি (সাহিত্য গবেষণা)
মুদ্রিত মূল্য: ৩৫০

৭২. মাহফুজুর রহমান
পৃথিবী বদলে দেওয়া ১০০ আবিষ্কার (বিজ্ঞান)
মুদ্রিত মূল্য: ৬০০

৭৩. সংকলন ও সম্পাদনা তাপস রায়
হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড় (রম্য) [মূল্য: ৩০০]

৭৪. রুবেল কান্তি নাথ
সফলতার রহস্য (আত্ম-উন্নয়ন)
মুদ্রিত মূল্য: ৩৫০

৭৫. মুহম্মদ মনিরুল হুদা
বুমেরাং (প্যারাসাইকোলজি)
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০

৭৬. ওপার সমুদ্রের কিস্‌সা
অনুবাদ মাজহার সরকার
মুদ্রিত মূল্য: ৩০০

বিগত বইয়ের হরফপত্র

- আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ
সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস (প্রবন্ধ)
মুদ্রিত মূল্য : ৫০০
- জাহানারা পারভীন
এবং এলিয়ট (ব্যক্তিত্ব পরিচয়)
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০
- শাহ্‌নাজ মুন্নী
প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর (ছোটোগল্প)
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০
- আবুল কাশেম
মুক্তির পরম্পরা (রাজনীতি)
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০
- জি এইচ হাবিব
ইংরেজি ভাষার ইতিহাস (অনুবাদগ্রন্থ)
মুদ্রিত মূল্য : ২৫০
- শহীদ ইকবাল
বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (সাহিত্য গবেষণা) [মুদ্রিত মূল্য : ১০০০]
- বিধান চন্দ্র দাস
বায়োএথিকস : তত্ত্ব, ইতিহাস এবং প্রয়োগ (বিজ্ঞান)
মুদ্রিত মূল্য : ৭০০
- মাসরুর আরেফিন
আড়িয়াল খাঁ (উপন্যাস) [মুদ্রিত মূল্য : ৩৫০]
- সফিক ইসলাম
গণিতকোষ (গণিত) [মুদ্রিত মূল্য : ১০০০]
- নাসির আলী মামুন
এস এম সুলতান : জীবন দর্শন ও শিল্প (জীবনী, ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস) [মুদ্রিত মূল্য : ৬০০]
- শারফিন শাহ
সংস্কৃতিচিন্তার কারখানা (সমাজ ও সংস্কৃতি)
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০
- ফারজানা সিদ্দিকা
নারীর সৃষ্টি : নারীর দ্বন্দ্ব (নারী ভাবনা)
মুদ্রিত মূল্য : ৪০০
- ফজলে রাব্বী
মৃণাল সেন : জীবন ও সিনেমা (চলচ্চিত্র)
মুদ্রিত মূল্য : ৩৫০
- সাদিকুর রহমান
মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতি (ইতিহাস)
মুদ্রিত মূল্য : ৮০০
- নাজমুল হুদা
প্যাসিভ পুরুষ (থ্রিলার)
মুদ্রিত মূল্য : ৩০০

৩০% ছাড়!

বিজ্ঞাপনটির ছবি তুলে আমাদের WhatsApp করুন, কিংবা হটলাইনে কল করে বুঝে নিন ৩০% ছাড়!

WhatsApp/Hotline
01324 25 46 31

অনলাইন অর্ডার
kathaprokash.com
kathaprokash

অক্ষর চলবে নক্ষত্রজুড়ে

তথ্যপ্রযুক্তিতে গ্রাম-শহরের বৈষম্য

শামীম হুসাইন

প্রতিষ্ঠাতা,
স্কিলআপার

আমার বাড়ি ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানার আগুনিয়াপাড়া গ্রামে। বাড়িতে সবকিছু প্রায় ঠিকঠাক চলছিল। অনেক পরিশ্রম আর যত্ন করে কাজটাও প্রায় শেষ করে এনেছিলাম। শুধু ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি দেওয়া বাকি। এসব সময় হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে এল। শুরু হলো তুমুল ঝড়বৃষ্টি। বিদ্যুৎ চলে গেল। এদিকে দ্রুত কাজ জমা দিতে হবে, কিন্তু বিদ্যুতের আর দয়া হয় না। দুই দিন পর বিদ্যুৎ এল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে ক্লায়েন্ট কাজটা ক্যানসেল করে দিয়েছেন। মনটা ভীষণ খারাপ হলো। যে কাজ নিয়ে এত পরিশ্রম, সেটিই পাঠানো গেল না।

আমি একজন ফ্রিল্যান্সার। পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং শেখাই। শুরুটা শহরে হলেও পরে গ্রামে ফিরে আসি। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় কারও সঙ্গে অনলাইনে, কারও সঙ্গে সরাসরি কাজের সূত্রে সম্পৃক্ত। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছি—গ্রাম ও শহরের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির গভীর বৈষম্য আছে। কোথাও ইন্টারনেট এত ধীরগতির যে একটি ফাইল আপলোড করতেই চলে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা; কোথাও আবার বৃষ্টি বা ঝড়ের পর বিদ্যুৎ-সংযোগ ঠিক হতে লেগে যায় দু-তিন দিন।

দুর্বল নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো

গ্রামের সবচেয়ে বড় সমস্যা দুর্বল ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ অবকাঠামো। একটু বৃষ্টি বা ঝড় হলেই কোথাও ফাইবার অপটিক লাইন কেটে যায়, কোথাও গাছ পড়ে পুরো এলাকা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে।

শহরে এসব সমস্যা এক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু গ্রামে একই সমস্যা সমাধানে লেগে যায় দুই থেকে তিন দিন, কখনো-বা তারও বেশি। বিদ্যুৎ না থাকলে মুঠোফোন টাওয়ারও বন্ধ হয়ে যায়। তখন পুরো গ্রাম নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে চলে যায়। এতে অনলাইন ক্লাস, মোবাইল ব্যাংকিং, সাধারণ ব্যাংকিং বা ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ—সব থেমে যায়।

কোথাও কোথাও মুঠোফোন টাওয়ারে ব্যাকআপ জেনারেটর থাকলেও সেসবের রক্ষণাবেক্ষণ দুর্বল। এ কারণে দীর্ঘ সময় নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন থাকলে মানুষ পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতা শুধু ইন্টারনেটের নয়, বরং পুরো ডিজিটাল জীবনের সীমাবদ্ধতাকেই সামনে নিয়ে আসে।

ইন্টারনেট স্পিডে অদৃশ্য বিভাজন

শহর ও গ্রামের ইন্টারনেট গতির মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। শহরে ইন্টারনেটের গতি ২৫ থেকে ৫০ এমবিপিএস। এই গতিতে ভিডিও কনফারেন্স বা বড় ফাইল অনায়াসে আপলোড করা যায়। কিন্তু গ্রামে ইন্টারনেটের গতি অনেক কম, ২ থেকে ৫ এমবিপিএসের মধ্যেই ওঠানামা করে। এ কারণে একই ফাইল আপলোড বা ডাউনলোডে সময় লাগে ১৫ থেকে ৩০ মিনিট।

টেলিকম কোম্পানিগুলোর মূল নেটওয়ার্ক অবকাঠামো এখনো শহরকেন্দ্রিক। গ্রামের টাওয়ারগুলো দুর্বল ব্যান্ডউইডথে চলে। তাই একসঙ্গে অনেক ব্যবহারকারী অনলাইনে সক্রিয় হলে নেটওয়ার্ক প্রায় স্থবির হয়ে যায়।

অধিকাংশ গ্রামে এখনো ফোর-জি নেটওয়ার্ক স্থিতিশীল নয়। ফোনে ফোর-জি থাকলেও সিগন্যাল থাকে 'ই' বা 'এইচ'। আবার কোনো গ্রামে শুধু নির্দিষ্ট ফোনের নেটওয়ার্ক চলে, বাকিগুলো দিয়ে কথা বলতে গেলে বারবার লাইন কেটে যায়।

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে প্রভাব

গ্রামের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় বাধা হলো অনলাইন শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সীমিত সুযোগ। এখন গ্রামের অনেক শিক্ষার্থীর হাতে স্মার্টফোন থাকলেও দুর্বল নেটওয়ার্ক তাঁদের বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই নেটওয়ার্কে ইউটিউবে মাঝেমধ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ভিডিও দেখা যায়। তবে জুম বা গুগল মিটের মতো প্ল্যাটফর্মে অনলাইন ক্লাসে অংশ নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ফ্রিল্যান্সিং বা অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কাজ করা গ্রামের তরুণদের জন্য প্রতিদিনের যুদ্ধের নাম এই নেটওয়ার্ক।

শহরের তরুণ-তরুণীরা এখন প্রযুক্তিকে হাতিয়ার বানিয়ে উদ্ভাবন করছেন, ব্যবসা গড়ে তুলছেন। ছবি : কবির হোসেন

গ্রামের নারীরা তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। ছবি : প্রথম আলো

নেটওয়ার্ক চলে গেলে গ্রাম থেকে ফ্রিল্যান্সিং বা অনলাইন মার্কেটপ্লেসের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, ক্লায়েন্টের ডেডলাইন মিস হয়। এতে মার্কেটপ্লেসে রেটিং কমে যায়। পরিস্থিতি এতটাই কঠিন যে অনেকে রাতে ঘরের বাইরে মুঠোফোন রেখে হটস্পট চালু রেখে কাজ সারেন।

কুড়িগ্রামের একজন শিক্ষার্থী একবার জুম ভিডিও কলে একটা কাজের জন্য আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল। প্রায় ২০ মিনিট পর আবার কল দিয়ে বললেন, ইন্টারনেটের নেটওয়ার্ক পেতে ফোনটা ঘরের বাইরে রেখে এসেছেন।

এটাই হলো গ্রামের বাস্তবতা। তবু তাঁরা হাল ছাড়েন না। দুর্বল সংযোগের মধ্যেও কাজ করেন, শেখেন, স্বপ্ন দেখেন—যদিও প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁদের কাছে সংগ্রাম।

> গ্রামে প্রতি ১০ জন নারীর মধ্যে মাত্র ৩ জন স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ৭০ শতাংশ নারী এখনো ডিজিটাল জগতের বাইরে।

স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও যোগাযোগে বাধা

শহরে এখন টেলিমেডিসিন বেশ জনপ্রিয়। ঘরে বসেই রোগী মুঠোফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে ভিডিও কলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন, রিপোর্ট পাঠাতে পারেন। এমনকি প্রেসক্রিপশনও পেয়ে যান।

কিন্তু গ্রামের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নেটওয়ার্ক দুর্বলতা, স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের অভাব এবং প্রযুক্তিগত অজ্ঞতার কারণে এসব বিষয় গ্রামে অনেকের কাছে এখনো অচেনা। এখানে অনেক সময় ছোট রোগ বড় আকার ধারণ করে, শুধু সময়মতো চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারার কারণে।

শহরে সামাজিক মাধ্যম এখন শুধু বিনোদন নয়, কর্মসংস্থানেরও অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। শহরের উদ্যোক্তারা ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম কিংবা টিকটক ব্যবহার করে অনলাইন শপ খুলছেন, গ্রাহক পাচ্ছেন, বিক্রি বাড়ছে। কেউ কেউ মূল আয়ের উৎস হিসেবেও এসব ব্যবহার করছেন। কিন্তু গ্রামে এসব প্ল্যাটফর্ম এখনো মূলত বিনোদনের জায়গায় সীমাবদ্ধ।

অনেকে গ্রামে থেকেও স্থানীয় পণ্য নিয়ে অনলাইন ব্যবসা শুরু করতে চাইলে নেটওয়ার্ক দুর্বলতা, ডেলিভারি সুবিধা না থাকা এবং অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতায় স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারেন না।

গ্রামের নারী ও ডিজিটাল বৈষম্য

গ্রামের নারীরা তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। শহরে এখন অনেক নারী ফ্রিল্যান্সিং, অনলাইন ব্যবসা, ডিজিটাল মার্কেটিং কিংবা কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মতো আধুনিক কর্মক্ষেত্রে নিজেদের যুক্ত করছেন। কিন্তু গ্রামের নারীরা এখনো সেই সুযোগের বাইরে।

পরিসংখ্যান বলছে, গ্রামে প্রতি ১০ জন নারীর মধ্যে মাত্র ৩ জন স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ৭ জন নারী এখনো ডিজিটাল জগতের বাইরে। তাঁরা অনলাইন শিক্ষা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ব্যাংকিং কিংবা স্বাস্থ্যসেবার মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো থেকেও বঞ্চিত।

আমার বেশ কিছু নারী শিক্ষার্থীর কেউ নেত্রকোনা থেকে, কেউ দিনাজপুরের গ্রামে বসে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ ও নেটওয়ার্ক সমস্যায় ক্লায়েন্টকে সময়মতো কাজ দিতে না পারায় এখন তাঁরা জেলা শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

শহরের তরুণ-তরুণীরা এখন প্রযুক্তিকে হাতিয়ার বানিয়ে উদ্ভাবন করছেন, ব্যবসা গড়ে তুলছেন, এমনকি বিশ্ববাজারেও কাজ করছেন। অন্যদিকে গ্রামের তরুণেরা একই প্রতিভা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতায় প্রতিনিয়ত পিছিয়ে পড়ছেন।

এই ব্যবধান শুধু প্রযুক্তির নয়—এটি সুযোগের, আস্থার এবং স্বপ্ন দেখার ব্যবধানও। তথ্যপ্রযুক্তি কেবল শহরের নয়, এটি বাংলাদেশের প্রত্যেক তরুণের অধিকার হওয়া উচিত। এই বৈষম্য দূর করতেই হবে।

পরপর তৃতীয়বার টেকসই ব্যাংকিং এর শীর্ষে

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সাস্টেইনেবিলিটি রেটিং ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ এর সেরাদের তালিকায় **যমুনা ব্যাংক পিএলসি**।

সমৃদ্ধির পথচলায় এই অর্জন আমাদের অনুপ্রাণিত করে সামনে এগিয়ে যাবার।

যমুনা ব্যাংক

KEPZ
KOREAN EPZ (KEPZ) CORPORATION (BD) LTD.
A YOUNGONE COMPANY

A World Class Eco friendly Industrial zone

Scalable manufacturing . Advanced weaving . Nature Positive Campus

Garment Production Floor
Innovative . Reliability . Sustainability

Advanced Weaving Lines
Precision looms , consistent quality

Water Bodies & Green Belt
Rainwater & biodiversity focus

YOUNGONE

২৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তে
প্রথম আলো
পরিবারকে
শুভেচ্ছা

Contact

Man- Made Fiber Textile Facility

E- mail :

jaeyongpark@youngone.com
ilchoi@youngone.com , kmuddin@youngonedhk.com
chiranjib.acharjee@youngonectg.com
bskim@youngone.com

Korean EPZ

E- mail :

mdshahjahan@youngonectg.com
kepzdhk@youngonedhk.com

রোবোটিক হাত ভেঙে দেবে বৈষম্যের দেয়াল

জয় বড়ুয়া

প্রতিষ্ঠাতা, রোবোলাইফ টেকনোলজিস

সুযোগের অভাবে কেন কেউ পিছিয়ে থাকবে—এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ আমাকে নিয়ে গেছে উদ্ভাবনের পথে। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের প্রথম সাশ্রয়ী রোবোটিক হাত।

কেউ জন্মগতভাবে, কেউ দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন হাত, আবার কেউ সমাজের সীমাবদ্ধতায় হারিয়েছেন নিজের স্বপ্ন। এসব দেখে ভাবতাম, প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে এই বৈষম্য কিছুটা হলেও দূর করা যায়। মূলত সেই ভাবনা থেকেই আমার উদ্ভাবনের পথে যাত্রাটা শুরু।

কৌতূহল থেকে মানবিক উদ্ভাবন

আমার জন্ম চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার জোবরা গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান ও রোবোটিকসের প্রতি ছিল আমার অদম্য কৌতূহল। বিশ্বাস করতাম, প্রযুক্তি তখনই অর্থবহ, যখন তা মানুষের কষ্ট কমায়। এ বিশ্বাস থেকেই মনে হয়েছে, এমন কিছু তৈরি করা যায় কি না, যা হাত হারানো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে পারে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। তখনই রোবোটিক হাত তৈরি করার কথা মাথায় এল। ২০১৭ সালে সিদ্ধান্ত নিলাম, হাত হারানো মানুষের জন্য এই রোবোটিক হাতই তৈরি করব।

> আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে ‘হাত আছে’ আর ‘হাত নেই’—এই বৈষম্য থাকবে না।

হার না মানা তারুণ্য

রোবোটিক হাত তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেও কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। শুরুতেই উপকরণ আর অর্থ—এই দুটি বাধা পাহাড়ের মতো সামনে এসে দাঁড়াল।

বিদেশে রোবোটিক হাত তৈরি হলেও দাম এত বেশি যে এ দেশের সাধারণ মানুষ কখনো তা ব্যবহার করতে পারবে না। তাই ভাবলাম, হাতের নাগালে থাকার মতো কিছু করতে হলে দেশীয় প্রযুক্তি ও সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে করতে হবে। এ কারণে প্লাস্টিক, হালকা ধাতু ও সাধারণ ইলেকট্রনিক সেন্সর ব্যবহার করে নিজেই গবেষণা শুরু করে দিই।

শুরুর দিকে কয়েকটি প্রোটোটাইপ (প্রাথমিক নমুনা বা মডেল, যা চূড়ান্ত পণ্য তৈরি করার আগে ধারণা যাচাই ও পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়) একদমই কাজ করেনি। কখনো আঙুল নড়ত না, কখনো সার্কিট পুড়ে যেত। কিন্তু আমি হারতে রাজি নই, তাই থামিনি। প্রতিটি ব্যর্থতা থেকে শিখেছি, এই ব্যর্থতাই আমাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

একবার ভেঙেছে, দুইবার পুড়েছে, কিন্তু তৃতীয়বার জ্বলে উঠেছে সাফল্যের আলো। অবশেষে একদিন সফল হলাম। তৈরি হলো স্মার্ট রোবোটিক হাত, যা দিয়ে ব্যবহারকারী লিখতে, ধরতে, এমনকি দৈনন্দিন নিজের কাজও করতে পারে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বুঝেছি, প্রযুক্তি কেবল যন্ত্র নয়, এটি মানুষের একধরনের স্বাধীনতার প্রতীকও বটে। যখন দেখি, যে ব্যক্তি একসময় নিজ হাতে চামচ ধরতে পারতেন না, এখন তিনি রোবোটিক হাত দিয়ে নিজের হাতেই খেতে পারছেন; যিনি লিখতে পারতেন না, এখন তিনি নিজের হাত দিয়েই নিজের নাম লিখছেন—সে মুহূর্তটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

রোবোলাইফের যাত্রা

২০১৮ সালে রোবোটিক হাত সবার কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্নটা বাস্তবে রূপ দিতে কয়েকজন তরুণ উদ্ভাবককে নিয়ে গড়ে তুলেছি রোবোলাইফ টেকনোলজিস। এখানে বর্তমানে দেশি-বিদেশি ১৫-১৬ জন তরুণ উদ্ভাবক কাজ করছেন। আমাদের লক্ষ্য, প্রযুক্তিকে মানুষের জীবনের অংশ করে তোলা।

বিশ্বের অনেক দেশেই রোবোটিক হাত নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু সেসবের দাম লাখ লাখ টাকা। বাংলাদেশের একজন সাধারণ মানুষের সেই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বা সামর্থ্য প্রায় নেই বললেই চলে। তাই আমরা বিদেশি প্রযুক্তির দামের ১০ ভাগের ১ ভাগের মধ্যে সমমানের কার্যকর কৃত্রিম হাত তৈরির চেষ্টা করছি। আমাদের তৈরি কৃত্রিম হাতের খরচ এত কম যে এটি গ্রামীণ বা নিম্নবিত্ত মানুষও ব্যবহার করতে পারবেন।

আমরা বিশ্বাস করি, উদ্ভাবন তখনই সফল হয়, যখন তা সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছায়। তাই রোবোলাইফ শুধু পণ্য বিক্রি করে না, আমরা কাজ করি সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়েও। আমরা দুর্ঘটনায় হাত হারানো মানুষদের পুনর্বাসনে কাজ করছি, তাঁদের জন্য আলাদাভাবে ডিজাইন করা কৃত্রিম হাত সরবরাহ করছি; যা শুধু চলাচল নয়, মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছে আত্মবিশ্বাস।

দেশ পেরিয়ে বিদেশের স্বীকৃতি

রোবোলাইফ টেকনোলজিসের যাত্রা খুব সাধারণভাবে শুরু হলেও এটি আজ বাংলাদেশে তরুণ উদ্ভাবকদের এক অনুপ্রেরণার নাম।

আমাদের অন্যতম বড় অর্জন হলো ২০২৫ সালে ‘স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশ’ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া। এর মাধ্যমে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি। এ ছাড়া ‘বিটিআরসি ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৫’-এ জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছি, যা আমাদের গবেষণার প্রতি সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

এ ছাড়া আমরা ২০২৪ সালে ‘ইউএনডিপি স্প্রিংবোর্ড প্রোগ্রাম ৭.০’-তে রানারআপ (ইয়ুথ কো-ল্যাব উদ্যোগের অংশ হিসেবে) এবং ‘গুগল অ্যানালিটিকস ইনসাইট ২০২২’-এ ‘টপ টেন ইয়াং রোবোটিকস রিসার্চারস’ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছি। আমাদের উদ্ভাবন ও উদ্যোগের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও।

মেড ইন বাংলাদেশ

আমরা এখন গর্ব করে বলতে পারি, বাংলাদেশে আমরাই প্রথম সাশ্রয়ী মূল্যের রোবোটিক হাত তৈরি করেছি। ইতিমধ্যে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ভারত ও তুরস্কে এই প্রযুক্তি প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছি। এসব অর্জন আমাদের দেশের তরুণদের সক্ষমতা বিশ্বে তুলে ধরেছে।

আমাদের লক্ষ্য এখন আরও বড়—এই প্রযুক্তিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যেন বাংলাদেশ থেকে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ লেখা রোবোটিক হাত বিশ্বে রপ্তানি করা যায়। আমাদের বিশ্বাস, এই দেশ একদিন উদ্ভাবনের দেশ হিসেবে বিশ্বে অবস্থান করে নেবে।

তরুণ উদ্ভাবকদের নতুন সম্ভাবনা

দেশে এখনো তরুণ উদ্ভাবকদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা খুব সীমিত। গবেষণা তহবিল, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বা পেটেন্ট সহায়তা না থাকায় তরুণদের অনেক স্বপ্ন মাঝপথে থেমে যায়।

সরকার যদি তরুণ উদ্ভাবকদের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করে, গবেষণার তহবিল, প্রযুক্তি হাব ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সুযোগ দেয়, তাহলে আরও অনেক তরুণ এগিয়ে আসবেন।

সরকারি সহযোগিতা পেলে বাংলাদেশও বিশ্বে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কেন্দ্র হতে পারে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া বা চীনের উন্নতির মূলে ছিল তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তি ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। বাংলাদেশেও সেই সম্ভাবনা আছে। শুধু দরকার একটু আস্থা, একটু সহায়তা।

আমরা চাই, রোবোলাইফ টেকনোলজিস একটি উদাহরণ হোক। যেখান থেকে ভবিষ্যতের উদ্ভাবকেরা শিখবে উদ্ভাবন মানে কেবল অর্থ উপার্জন নয়, বরং সমাজে পরিবর্তন আনা।

বৈষম্য ভাঙার হাত

রোবোলাইফের গবেষণা ও উদ্ভাবন কেবল প্রযুক্তিগত অর্জন নয়, এটি সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে ‘হাত আছে’ আর ‘হাত নেই’—এই বৈষম্য থাকবে না। আমাদের রোবোটিক হাত এখন শুধু একটি পণ্য নয়, বরং মানবিকতার প্রতীক।

তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে বলতে চাই, স্বপ্ন দেখো, চেষ্টা করো, ব্যর্থ হও, আবার উঠে দাঁড়াও। প্রযুক্তি তোমার হাতকে শক্তি দেবে, কিন্তু তোমার মনই দেবে পথের দিশা। সীমাবদ্ধতা নয়, উদ্ভাবনই মানুষের আসল শক্তি।

আমি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চাই, যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না—না সুযোগে, না প্রযুক্তিতে, না জীবনে। যেখানে প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্যে সমাজে অবদান রাখবে। আর সেই ভবিষ্যতের প্রথম পদক্ষেপই এই রোবোটিক হাত, যা শুধু একটি যন্ত্র নয়, এটি বাংলাদেশের মানবিক প্রযুক্তি বিপ্লবের সূচনা।

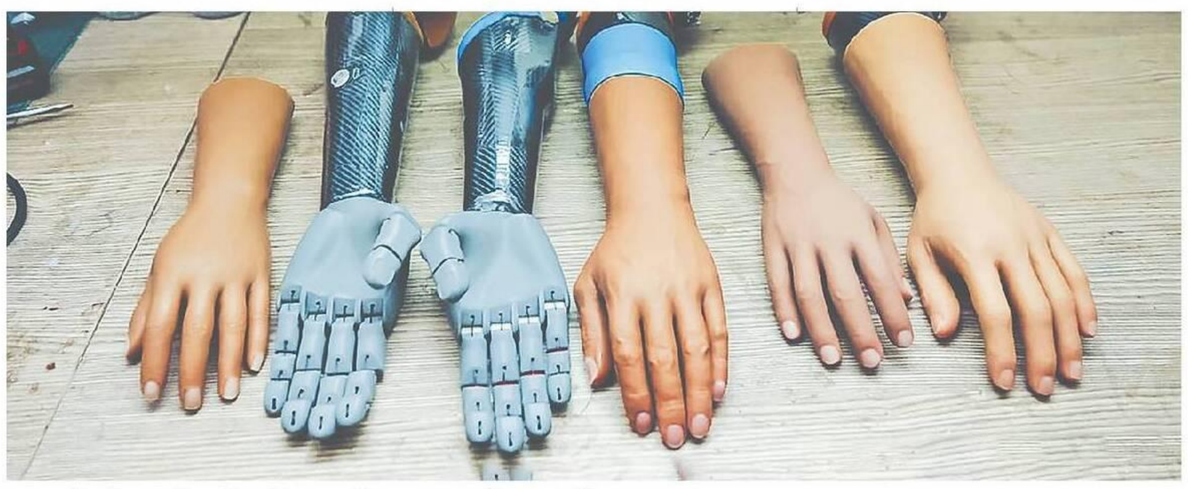

রোবোলাইফ টেকনোলজিসের উৎপাদিত রোবোটিক হাতের কয়েকটি নমুনা। ছবি : প্রথম আলো

২০১৮ সালে যাত্রা শুরু করে রোবোলাইফ টেকনোলজিস। ছবি : প্রথম আলো

10606

LABAID Diagnostics ...Home of Trust

দেশজুড়ে ৩৩টি শাখা নিয়ে
ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস
একই ছাদের নিচে সকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও রোগ নির্ণয়ের সবধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সেই ১৯৮৯ সাল থেকে সকলের আস্থা হয়ে আছি

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাথে যুগোপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি এবং যোগ্য জনবল নিয়েই ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস।

এরই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস প্রতিনিয়ত সংযোজন করছে বিশ্বের সর্বাধুনিক সব প্রযুক্তি, পাশাপাশি মানোন্নয়নের অব্যাহত যাত্রায় অর্জন করছে মূল্যবান দেশী ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

আমরা এখন বিশ্বের যেকোনো উন্নত ডায়াগনস্টিকস সেন্টারের সমকক্ষ। দেশের চিকিৎসা পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই প্রয়াসে আপনাদের আস্থাই আমাদের প্রধান অনুপ্রেরণা।

CAP ACCREDITED
COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS
দেশের প্রথম ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি হিসেবে CAP সনদপ্রাপ্ত

BAB
দেশের প্রথম BAB সনদপ্রাপ্ত

কেন আমরাই সেরা

■ দেশের সেরা ল্যাব কনসালটেন্ট
আমাদের ল্যাবরেটরিতে রয়েছে দেশের খ্যাতনামা ল্যাব বিশেষজ্ঞরা, যারা সার্বক্ষণিক সব ধরনের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করেন।

■ ৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা
৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশ / বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করছে।

■ CAP -এর স্বীকৃতি
স্বাস্থ্য পরীক্ষায় প্রথম বাংলাদেশি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি হিসেবে ল্যাবএইড অর্জন করেছে CAP Accreditation যা বিশ্বের অন্যতম কঠোর ল্যাবরেটরির মান পরীক্ষাকারী সংস্থার স্বীকৃতি।

■ BAB -এর স্বীকৃতি
আমাদের ল্যাব বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)-এর স্বীকৃতি লাভ করেছে।

■ টোটাল ল্যাব অটোমেশন (টিএলএ)
এখানে রয়েছে টোটাল ল্যাব অটোমেশন যার ফলে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক পদ্ধতিতে দ্রুত, সঠিক, সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট নমুনা বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়।

■ মানসম্মত ল্যাব রিয়েজেন্ট
মান বজায় রাখার জন্য আমাদের ল্যাবে ব্যবহৃত ৯০% কেমিকেল ও রিয়েজেন্ট বিদেশের বিখ্যাত কোম্পানি থেকে সরাসরি আমদানি করা হয়।

■ বিশেষ বিভাগ
আমাদের আছে অত্যাধুনিক PCR ল্যাব, মলিকুলার অনকোলজি ও ফার্মাকোজেনেটিক ল্যাব, হিস্টোপ্যাথলজি/ সাইটোলজি ল্যাব। এবং দেশের একমাত্র রেফারেন্স ল্যাব।

■ ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান
২৪ ঘণ্টা খোলা। জরুরি সেবা ও রিপোর্ট দেয়া।

■ অনলাইনে রিপোর্ট ডেলিভারি
অনলাইনে প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট প্রদান।

মান নিয়ন্ত্রণ

- বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ ল্যাব কনসালটেন্ট দ্বারা মান পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- BIO-RAD (USA) ও RANDOX (UK) এর সহযোগিতায় ISO 15189:2012 এর নির্দেশনা অনুযায়ী External Quality Control এবং Internal Quality Control দ্বারা পরীক্ষার ফলাফল এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিকস) বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ ওয়েব: www.labaiddiagnostics.com

নবগঙ্গার পানিতে জীবন লিখেছি

সোনিয়া আক্তার

জাতীয় সাঁতারু

ঝিনাইদহের ভুটিয়ারগাতি গ্রামটা নকাঙ্গা নদীর তীরে। সেই নদীই আমার প্রথম পাঠশালা। সেখানে আমি শিখেছি, পানি মানেই জীবন আর জীবন মানেই লড়াই।

ছোটবেলায় বুঝতাম না পৃথিবী কেমন। জানতাম শুধু নদীর পানিতে ডুব দিতে ভালো লাগে। যখন গ্রামের মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলত, আমি ছুটে যেতাম নদীর ঘাটে। আমি যেন নদীর ডাক শুনতে পেতাম আর ওই ডাকে সাড়া দিতাম প্রতিবার।

গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ সাঁতারটা ভালো চোখে দেখেন না। সাঁতারের পোশাক পছন্দ করেন না। অনেকে আমার পরিবারকে বলেছেন, আমি কেন সুইমিং করি। আত্মীয়স্বজনের অনেকে বলতেন, মেয়ে কেন খেলাধুলা করবে? তবে আমার মা-বাবা বলতেন, 'ওর ভালো লাগলে খেলুক।'

বাবা আনিসুর রহমান একসময় পানের দোকানি ছিলেন, পরে মুদিদোকান চালাতেন। বাবা মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরেও ছিলেন কিছুদিন। আমরা দুই বোন, এক ভাই। বড় ভাই শামসুর রহমান নকাঙ্গা নদীতে সাঁতার শিখতেন জাহিদ মোল্লার কাছে, যিনি সম্পর্কে মামা হন। মায়ের অনুমতি নিয়ে ভাই সঙ্গে নিতেন আমাকে। শুরুতে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু নবগঙ্গার পানি যেন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। বড় ভাইয়ের মতো পরে জাহিদ মামার কাছে সাঁতার শিখেছি।

২০০৩ সালে প্রথম ঢাকায় আসি জাতীয় জুনিয়র প্রতিযোগিতায় খেলতে। ৮-৯ বছর বয়স। ঢাকার শিরপুর সুইমিংপুলে এক ইভেন্টে দ্বিতীয়, আরেকটায় তৃতীয় হয়েছিলাম। কী যে আনন্দ হয়েছিল, বোঝাতে পারব না। পদকগুলো সবাইকে দেখাতাম।

নদী থেকে পুলে

সেবারই প্রথম বুঝেছিলাম, আমার ভেতরে একটা শক্তি আছে। ঢাকায় এসেছিলাম অনেকের সঙ্গে। রাজধানী শহরের কিছুই চিনতাম না। শিরপুর সুইমিংপুলেই খেলা, ঘোরফেরা আর ওখান থেকেই বাড়ি ফেরা।

২০০৪ সালে শিশু একাডেমির প্রতিযোগিতায় দুটি সোনা জিতলাম—ফ্রিস্টাইল আর ব্যাকস্ট্রোকে। তারপর বগুড়ায় জাতীয় জুনিয়র গেমসে ছয় ইভেন্টে ছয়টিতেই দ্বিতীয়। তখন বিকেএসপির সোলেমান স্যার আমাকে দেখে বললেন, 'তুমি বিকেএসপিতে ভর্তি হবে?'

তখন জানতাম না, বিকেএসপি কী। কিন্তু বলেছিলাম, 'হব।'

১৪ দিনের ক্যাম্প শেষে ২০০৪ সালের নভেম্বরে বিকেএসপিতে ভর্তি হই। অচেনা জায়গা, কঠোর রুটিন। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝলাম, এই কষ্টই আমাকে গড়বে।

টুম্পা এখনো খেলে

২০০৭ সালে প্রথমবার ঢাকার শিরপুর সুইমিংপুলে সিনিয়র জাতীয় প্রতিযোগিতায় নামি। প্রতিযোগিতায় সম্ভবত সাতটা সোনা জিতি। সেই থেকে কখনো কোনো জাতীয় প্রতিযোগিতায় গরহাজির ছিলাম না। ১৬টি জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। প্রতিবারই পদক পেয়েছি। এই ৩২ বছর বয়সেও গত মাসে শিরপুরের পুলে ৩৪তম জাতীয় সাঁতারে ১৪টি ইভেন্টের ১১টিতে সোনা জিতেছি। বাকি ৩টি রুপা। ১১টি সোনার ৬টি ব্যক্তিগত, ৫টি দলীয়।

এখনো সুইমিংপুলে নেমে সোনা কুড়াই। একটা নেশায় যেন পেয়ে বসেছে। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য, সিনিয়র পর্যায়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমি ১১০টির বেশি স্বর্ণপদক জিতেছি। রুপা-ব্রোঞ্জ মিলিয়ে পদক হবে দেড় শ। এখনো পুলে নামালে মানুষ অবাক হয়ে বলে, 'টুম্পা এখনো খেলে?'

টুম্পা আমার ডাকনাম। হ্যাঁ, আমি এখনো খেলি। কারণ, আমি সাঁতার ভালোবাসি। আমার সময়ের সাঁতারুরা খেলে ছেড়েছেন বেশ আগেই। বাংলাদেশের মেয়েরা 'কুড়িতে বুড়ি'—এই কথাকে আমি ভুল প্রমাণ করেছি।

ইন্দো-বাংলা গেমসে ৫০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে সোনা জিতেছি। অংশ নিয়েছি তিনটি দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে (এসএ গেমস), দুটি অলিম্পিকে—২০১০ সালের যুব অলিম্পিকে (সিঙ্গাপুর) আর ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচবার খেলেছি। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে খেলেছি স্বামী আসিফ রেজাসহ। হাঙ্গেরি, রাশিয়া, চীন, ভারত, নেপাল, আবুধাবির মতো দেশে খেলেছি।

এত দেশ দেখেছি, এত মানুষ চিনেছি; কিন্তু মনের গভীরে আমি এখনো নবগঙ্গার মেয়ে। যে জাতীয় প্রতিযোগিতায় সোনা জেতার সুবাদে বিকেএসপিতে বিনা বেতনে অনেকটা সময় পড়েছে। বিকেএসপিতে যখন ছিলাম, হয়তো ছুটি পেতাম না। হয়তো একটা গেম ছিল, ঈদে ছুটি দেয়নি। পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে পারিনি। এমনও হয়েছে, ঈদের দিনও অনুশীলন করেছি। খারাপ লাগত। কিন্তু মনকে বোঝাতাম, খেলা শেষ হলেই বাড়ি যাব।

২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশ আনসারে চাকরি করেছি তিন বছর। আমার মা এখনো বলেন, 'তুই ছোটবেলায় সংসারে টাকা দিয়েছিস। তুই বড় গুণী মেয়ে।' ২০১৩ সালে যোগ দিই বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে। এখন আমি প্রধান পেটি অফিসার। আমার স্বামী আসিফ রেজাও নৌবাহিনীতে। সে-ও সাঁতারু, জাতীয় প্রতিযোগিতায় সোনাজয়ী, বিকেএসপির শিক্ষার্থী। অনেকে আমাদের বলে 'জলের দম্পতি'।

যেখানে কষ্ট

আমাদের সাঁতারে তেমন স্বীকৃতি নেই, নেই অর্থ। সর্বশেষ জাতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো পদক জেতার জন্য অর্থ পুরস্কার দিয়েছে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন। সোনার জন্য ২ হাজার, রুপায় ১ হাজার, ব্রোঞ্জে ৫০০ টাকা।

রিলে ইভেন্টে সেটা চারজনে ভাগ হয়ে যায়। সোনা জিতলে ৫০০ টাকা পড়ে একেকজনের ভাগে। ব্রোঞ্জের জন্য ২০০ টাকাও না। অন্যদিকে ক্রিকেট-ফুটবলের মেয়েরা লাখ লাখ টাকা পায়, মিডিয়ায় আসে প্রতিদিন। আমরা পুলের পানিতেই ঘাম ঝরাই, কারও চোখে পড়ি না।

মাত্রই ফুটবলের মেয়েদের সরকার ৫০ লাখ টাকা দিয়েছে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার জন্য। যুব এশিয়া কাপে ব্রোঞ্জ জেতায় নারী হকি দল পেয়েছে ২১ লাখ টাকা। ফুটবলের মেয়েরা জনপ্রতি দেড় লাখ টাকার বেশি আর হকির মেয়েরা পেয়েছে জনপ্রতি এক লাখ টাকা।

তারপরও আমরা সাঁতরাই, ভালোবেসেই পানিতে নামি। কেউ সাঁতরান একটা চাকরির আশায়। আমাদের সাঁতারে বছরে একটামাত্র জাতীয় প্রতিযোগিতা হয়। সেটা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত খরচই হয়ে যায় অনেক টাকা। নিয়মিত অনুশীলন, খাবার, পোশাক ইত্যাদির জন্য ৩০-৫০ হাজার টাকা লাগে।

রাষ্ট্র, বিভিন্ন সংস্থা ক্রীড়াক্ষেত্রে পুরস্কার দেয়, কিন্তু সুইসিংয়ের জন্য কিছুই থাকে না। আমাদের ফেডারেশন বা সংস্থা দেয়, ওটাই আমাদের প্রাপ্তি।

জাতীয় প্রতিযোগিতায় সোনা জিতলে সংস্থা থেকে ৫ হাজার টাকা করে দেয়। এবার ১১টা সোনার জন্য আমার ৫৫ হাজার টাকা পাওয়ার কথা, এমন হিসাব করলে ভুল হবে। এর মধ্যে ৫টি সোনা যে রিলেতে। এই টাকা চারজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

তবু স্বপ্ন

মাঝেমধ্যে মনে হয়, আর খেলব না। তারপরও খেলি। কারণ, আমি সাঁতারেই জীবন বেঁধেছি। এখন শুধু চাওয়া একটাই—আমার দেশের মেয়েরা যেন সাঁতার শিখতে ভয় না পায়। তারা যেন ভাবে, 'টুম্পা পারলে আমরাও পারি।' এই দেশে নারী খেলোয়াড় মানেই সংগ্রামী মানুষ। তাদের জন্য সঠিক প্রশিক্ষণ, সঠিক মূল্যায়ন—এমনকি সামান্য সম্মান—সবই অপ্রতুল।

সাঁতারের জীবন খুব কঠিন। ভোরে উঠে পুলে নামতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন। একদিন না নামালে ফিটনেসে ঘাটতি দেখা দেয়। সুইমিং কেউ দেখতেও আসে না। অথচ সুইমিং দেখতে টিকিট লাগে না।

আমার বাবার শরীর এখন ভালো নয়। মা বলেন, 'আর খেলিস না, বিশ্রাম নে।' হাসি দিয়ে বলি, 'আরেকটা জাতীয় গেম শেষ হোক, তারপর দেখি।' মা বোঝেন না, খেলাটা আমার ধমনিতে। তবে মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। হয়তো এবার বিদায় বলব।

আমার ঘরে যত পদক আছে, তার প্রতিটা আমার জীবনের একটা অধ্যায়। প্রতিটা সোনার পেছনে আছে ব্যথা, ঘাম আর নীরব কান্না। কখনো কখনো রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, হাত-পা এখনো ব্যথায় টনটন করছে। তবু মন চায় সকালে আবার পুলে নামতে।

২০০৩ থেকে ২০২৫ সাল—২২ বছরের সাঁতারুজীবনে নিজের প্রতি সৎ থেকেছি। খেলাকে ভালোবেসেছি এবং দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে চেয়েছি। নবগঙ্গার পানিতে আমি জীবন লিখেছি।

তারুণ্যের জয় মানে দেশের জয়

মোস্তফা আল মমিন

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
পালকি মোটরস লিমিটেড

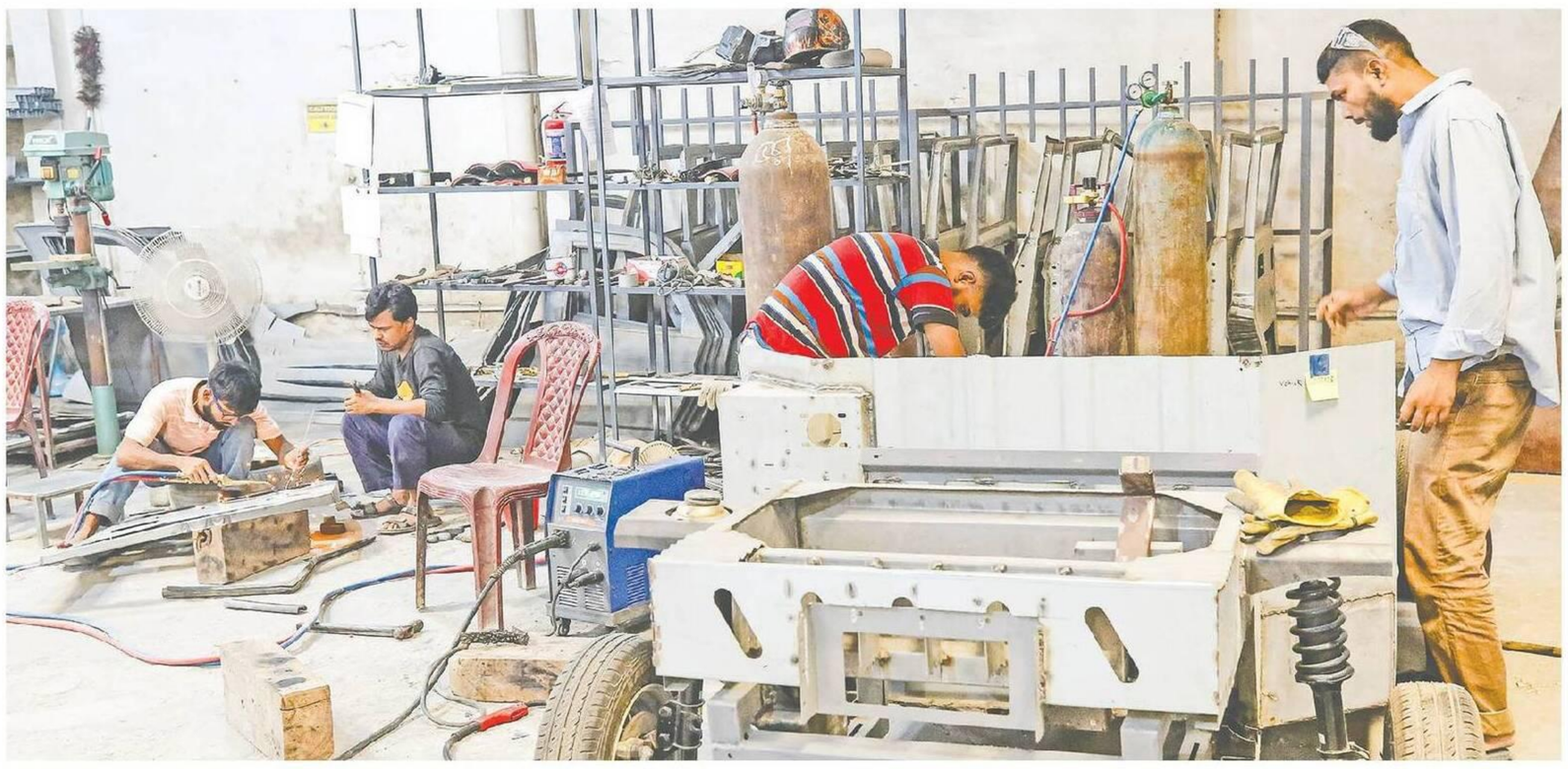

২০২২ সালের মার্চে যাত্রা শুরু করে দেশীয় গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি ‘পালকি মোটরস’। ছবি : মীর হোসেন

দেশের রাজপথে গত বছর তরুণেরা ঐতিহাসিক এক মুহূর্ত তৈরি করেছিলেন, গণ-অভ্যুত্থান। চাকরিতে কোটা-বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনটা শুরু করেছিলেন জেন-জিরা, তা ক্রমে এক সামাজিক জাগরণে রূপ নিয়েছিল।

লাখো মানুষ সেদিন রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন ঘুষ, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে। কেউ যদি ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একটি উদ্যোগ শুরু করেন, তার মধ্যে অন্তত ১০ হাজার টাকা চলে যায় ঘুষ আর অনিয়মে। অথচ এই টাকাটা একজন তরুণের তিন মাসের খরচ। ওই সময় তিনি কোডিং করে পৃথিবীর সেরা অ্যাপগুলোর একটি বানাতে পারতেন। এই অর্থ আধুনিক প্রজন্মের কাছে ‘রাড মানি’। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে সেদিন তরুণদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে এসেছিল সাধারণ মানুষ।

এমন বৈষম্য কেবল আর্থিক নয়-বৈষম্য আছে শিক্ষায়, সরকারি নীতিমালায়, এমনকি স্বপ্ন দেখায়ও। আর এই বৈষম্যের আমি ও আমার প্রজন্ম প্রতিদিন লড়াই করে যাচ্ছি।

রাস্তায় স্বপ্নের শুরু

২০০৯ সাল। তখন আমি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। ক্লাসে ইলেকট্রিক মোটর শেখানো হচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে শিখি। প্রতিদিন উত্তরার বাসা থেকে মহাখালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হতো। পথে মোটর মেরামতের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম, কীভাবে গাড়ির যন্ত্রপাতি খুলে আবার জোড়া লাগানো হয়। তখন থেকেই নিজের হাতে গাড়ি বানানোর স্বপ্ন জাগে মনে।

পুলিশ স্টেশনের সামনে যেসব পরিত্যক্ত গাড়ি পড়ে থাকে, সেখান থেকে একটি নিখরচায় পাওয়া গেলে তাতে হাইটর্ক মোটর লাগিয়ে একটি ইলেকট্রিক গাড়ি বানানো যেতে পারে—মাথার ভেতর এমন ভাবনাই ছিল। তখন টেসলা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না।

পরে এমন একটি গাড়ির ডিজাইন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোসাদ্দেক স্যারের হাতে দিই। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। পরে ওই ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে একটি গাড়ি বানানো হয়। এরপর ক্রেডিট ট্রান্সফার করে পড়তে যাই যুক্তরাষ্ট্রে, মন্টানা ইউনিভার্সিটিতে। অর্ধেক স্কলারশিপ পেলেও বাকি খরচ জোগাতাম পুরোনো গাড়ি কিনে মেরামতের পর তা বিক্রি করে। পাশাপাশি দু-তিনটি ছোট চাকরিও করেছি।

তবে সব সময় একটাই চিন্তা ঘুরত মাথায়—আমি কবে দেশে ফিরব! কারণ, বাংলাদেশের বৃষ্টি, সবুজ প্রকৃতি, মাটির গন্ধ আর নিজের ভাষায় কথা বলার আনন্দ ও শান্তি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

‘পালকি’র গল্প

শেষমেশ পাঁচ বছর পর ২০১৬ সালে দেশে ফিরলাম। স্বপ্ন ছিল নিজের একটি গাড়ি কোম্পানি গড়ব। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব কিছুই জানা নেই। তাই সময় লেগে গেল। বহু বাধা পেরিয়ে ২০২২ সালের মার্চে ‘পালকি মোটরস’ যাত্রা শুরু করল। আমাদের কারখানা ঢাকার উত্তর বাড্ডায় সাতারকুল সড়কে।

পালকি মোটরসের আইডিয়াটা এসেছিল মেডিটেশনের সময়, সঙ্গে ছিল নেপোলিয়ন হিলের *থিংক অ্যান্ড গ্রো রিচ* বইটি। বইয়ের পরামর্শমতো প্রথমে নিজের স্বপ্নগুলো লিখে ফেলি। কী করতে চাই, জীবনে কী অর্জন করতে চাই—সব। যেমন বাংলার এন্ডেমিক গাছপালা ও প্রাণী সংরক্ষণে বন তৈরি করব, যা মহাকাশ থেকেও দেখা যাবে।

ওয়েটেড স্যাট্রিক্স ব্যবহার করে কোন আইডিয়ার বাজার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তার বিশ্লেষণ করি। এতে পালকি সবার ওপরে থাকে। তারপর শুরু হয় মনের প্রোগ্রামিং। প্রতিদিন আমার স্বপ্নকে কল্পনায় দেখি। অনুভব করি আমার ফ্যাক্টরি, কর্মচারী, গাড়ি—সবকিছু।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। গাড়ির যন্ত্রপাতি আনতে লাগবে সাড়ে সাত লাখ টাকা, অথচ আমার তিনটা ক্রেডিট কার্ডেরই সীমা শেষ। এই পরিস্থিতিতে একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করে ঋণ শোধ করার পর হাতে থাকল মাত্র ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। মামার কাছ থেকে ধার করলাম ৫০ হাজার। সেই টাকা দিয়েই যন্ত্রপাতি অর্ডার করে এনে কাজ শুরু করা হলো।

> সরকার সম্প্রতি ‘ইলেকট্রিক ভেহিকেল নীতিমালা ২০২৫’ প্রণয়ন করেছে, যা কাগজে-কলমে বিপ্লবী মনে হলেও বাস্তবে বড় কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করছে।

অবশেষে আমরা বানালাম নিজেদের ডিজাইনে বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈদ্যুতিক গাড়ি। যার প্রতিটি ইঞ্চি তৈরি হয়েছে এই দেশের তরুণদের হাতে।

স্বপ্নের পথে অবিচল

এই পথচলায় কত ব্যঙ্গ ও কত তির্যক মন্তব্য শুনেছি। অনেক কষ্ট সয়েছি। কেউ বলেছে, এসব করে জীবন নষ্ট করে ফেলছি। কিন্তু আমার সামনে একটাই প্রশ্ন ছিল, স্বপ্ন কি কেবল ধনীদের জন্য? গাড়ি কি কেবল উন্নত দেশগুলোই বানাবে?

আমরা এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। আমরা আমাদের স্বপ্নের পথেই থেকেছি। ২০২২ সাল থেকে গবেষণা করে তৈরি করেছি ইলেকট্রিক গাড়ি, পিকআপ। আমাদের গাড়িগুলো সব মিলিয়ে প্রায় ১৮ লাখ কিলোমিটার চলেছে। হাজারো মানুষ এই গাড়ির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষই আমাদের প্রধান গ্রাহক। তাঁরা আমাদের গাড়ি কিনে চালিয়ে আদতে শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধপথে ছুটছেন।

আমাদের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি এসেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। ‘জায়েদ সাসটেইনেবিলিটি প্রাইজ ২০২৫’-এ ১৫১টি দেশকে পেছনে ফেলে ‘এনার্জি’ বিভাগে জয়ী হয়েছি। পেয়েছি ১ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার। সিঙ্গাপুরের ‘এক্সিলারেটিং এশিয়া’ প্রোগ্রাম থেকে তহবিল পেয়েছি।

এটা শুধু আমার একার সংগ্রাম নয়। এটি হাজারো তরুণের গল্প, যাঁরা প্রতিদিন আর্থিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেদের জন্য, দেশের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছেন। এই গল্প সেই তরুণ-তরুণীর, যাঁরা বৈষম্যের মধ্যেও হাল ছাড়েন না।

বৈষম্যের দেয়াল ভাঙার লড়াই

সরকার সম্প্রতি ‘ইলেকট্রিক ভেহিকেল নীতিমালা ২০২৫’ প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা কাগজে-কলমে বিপ্লবী মনে হলেও বাস্তবে এটি বড় কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করছে।

সিবিইউ (সম্পূর্ণ আমদানি করা) গাড়ির জন্য আমদানি শুল্ক মাত্র ৩০ শতাংশ, আর সিকেডির (স্থানীয়ভাবে অ্যাসেম্বল করা) জন্য শুল্ক ১৫ শতাংশ, যা সিকেডি প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

দেশীয় নির্মাতাদের ওপর চাপানো হয়েছে কড়াকড়ি নিয়ম। কাঁচামালে ১ শতাংশ শুল্ক পেতে হলে কোটি টাকার যন্ত্রপাতির বাধ্যবাধকতা, পরিদর্শনের নামে ঘুষের চাপ—সব মিলিয়ে ছোট উদ্যোক্তারা যেন কখনোই বিদেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে না পারে। যেন তারা বলতে না পারে, ‘আমরাও গাড়ি তৈরি করি।’

আমরা চাই সরকার এই বৈষম্য দূর করুক, বিআরটিএতে ঘুষ এবং দুর্নীতি বন্ধ হোক। এসএমই উৎপাদন খাতে কাঁচামালের ওপর ১ শতাংশ আমদানি শুল্ক চালু হোক। দেশের মাটিতে উদ্ভাবিত গাড়িগুলোর রাস্তায় পরীক্ষার অনুমতি সহজ করা হোক। গ্রিন ফাইন্যান্স সবার নাগালে আসুক এবং ৫০০ কোটি টাকার স্টার্টআপ ফান্ড যেন সহজ শর্তে দেশি ও বিদেশি যোগ্য ফান্ড ম্যানেজারদের মাধ্যমে সুষম ও বৈষম্যহীনভাবে বণ্টন করা হয়।

এই নীতিগত বৈষম্য দূর করা না গেলে পালকি মোটরসের মতো হাজারো সম্ভাবনা হারিয়ে যাবে। তাই এখনই এমন একটি পরিবেশ দরকার, যেখানে তরুণেরা উদ্ভাবনে এগিয়ে যেতে ভয় পাবেন না, বরং রাষ্ট্র তাঁদের পাশে দাঁড়াবে।

শিক্ষায় চাই বাস্তব জ্ঞান

বলা হয়, বাংলাদেশে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর গড় মান আন্তর্জাতিক মানের অষ্টম শ্রেণির সমান। প্রতিবছর লাখ লাখ স্নাতক বের হন, কিন্তু বাস্তব দক্ষতার ঘাটতিতে চাকরি পান না। চাকরির সাক্ষাৎকারে দেখা যায়, তাঁরা সমস্যা সমাধানে দুর্বল, আত্মনির্ভরশীল নন। কারণ, শিক্ষাব্যবস্থা তাঁদের বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করেনি।

এদিকে সেরা শিক্ষার্থীরাও বিসিএস পরীক্ষার জন্য দুই বছর প্রস্তুতি নিয়ে নিজেদের দক্ষতা হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের অনেকেই বিসিএসে সফল হন না, আবার চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন।

এই বাস্তবতা বদলাতে হলে শিক্ষা খাতে জিডিপির অন্তত ৫ শতাংশ বরাদ্দ দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ গবেষণার সুযোগ বাড়াতে হবে। যাতে কোম্পানিগুলো গবেষণায় অর্থায়ন করে এবং অধ্যাপকেরা বেশিসংখ্যক গবেষণা সহকারী নিয়োগ দিতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে শিখতে পারবেন, প্রকৃতপক্ষে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন। শুধু সার্টিফিকেট নয়, বাস্তব জ্ঞানই পারে তরুণদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে।

তরুণদের জয় মানে দেশের জয়

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এখন আর শুধু স্বপ্ন দেখে না, তারা সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চায় এবং সে জন্য সংগ্রাম করতেও প্রস্তুত। প্রতিটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে, প্রতিটি অনিয়মের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হচ্ছে। প্রযুক্তি, শিল্প, শিক্ষা—সবখানে প্রমাণ করছে সুযোগ পেলে তারাও বিশ্বমানের কিছু তৈরি করতে পারে।

কিন্তু সেই সুযোগ এখনো সবার জন্য সমান নয়। বৈষম্য যখন একজন স্বপ্নবান তরুণকে থামিয়ে দেয়, তখন সেটি শুধু ব্যক্তিগত নয়, জাতীয় ক্ষতি। একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তরুণদের ওপর। তাদের স্বপ্ন দেখার অধিকার, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা চাই। সে জন্য রাষ্ট্রকে তরুণের পাশে থাকতেই হবে। নীতিমালা হতে হবে তরুণবান্ধব।

তাই সরকার, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ—সবার উচিত তরুণদের পাশে দাঁড়ানো। কারণ, তারুণ্যের জয় মানেই দেশের জয়।

বৈষম্য দূর হবে বাস্তব উদ্ভাবনে

মো. তাসনিমুল হাসান

উদ্ভাবক,
ফিলাইট

অন্ধকারে গ্রামের পুকুরে জ্বলছে অদ্ভুত এক আলো। এই আলোর উৎস সৌরশক্তি। আলোয় ভিড় করছে পোকামাকড়। পুকুরের পানির নিচে আনন্দে খলবল করছে মাছের ঝাঁক। কারণ, পোকাগুলো পানিতে পড়ে পরিণত হচ্ছে মাছের খাবারে। 'ফিলাইট' নামের সৌরশক্তিচালিত এই বাতি বদলে দিচ্ছে মাছ চাষের চিত্র।

আমার এই আলো বা বাতি উদ্ভাবনের গল্পটি শুরু হয়েছিল গ্রামের পুকুর থেকে। গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে জন্মেছি। ছোটবেলা থেকেই ভাবনা ছিল, প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনটাকে যদি একটু সহজ করা যেত! সেই ভাবনা থেকেই ফিলাইট উদ্ভাবনের যাত্রা শুরু হয়।

তারুণ্যের শক্তি মানে পরিবর্তনের সাহস

তারুণ্য কেবল বয়সের সংখ্যা নয়, একধরনের শক্তি। এই শক্তি সমাজ বদলে দিতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় ৪২ লাখ মাছের পুকুরে লাখো কৃষক কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের আয়টা প্রায়ই নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর। আর মাছের খাবারের বাড়তি খরচ তাঁদের জন্য বড় বাধা।

নওগাঁর মান্দা উপজেলার পশ্চিম দুর্গাপুর গ্রামের ছেলে আমি। গ্রামের ছেলে হওয়ায় এই বাধার বিষয়টি আমাকে খুব ভাবাত। একসময় ভাবলাম, যদি এমন কোনো ডিভাইস তৈরি করা যায়, যা বিদ্যুৎ ছাড়াই মাছের খাবারের বিকল্প তৈরি করে দিতে পারে! ২০২৩ সালে সেই ভাবনা থেকেই মাত্র ১৯ বছর বয়সে সাহস করে তৈরি করি ফিলাইট (Felight)।

আলোর ফাঁদে মাছের খাবার

ফিলাইট মূলত সৌরশক্তিচালিত পোকামাকড় আকৃষ্টকারী একধরনের বাতি। এই বাতি রাতে পুকুরের মাঝখানে স্থাপন করা হলে আলো ছড়ায়। সেই আলোয় আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় ভিড় করে ফিলাইটের ওপর। এরপর পোকাগুলো পানিতে পড়ে মাছের খাবারে পরিণত হয়।

ডিভাইসটি কম খরচে এবং বিদ্যুৎ ছাড়াই চলে। তাই কৃষকের খরচ কমে, উৎপাদন ও আয় বাড়ে।

এক তরুণের একার লড়াই

এই যাত্রা মোটেও সহজ ছিল না। ২০২৪ সালে আমার বয়স ছিল ১৯ বছর। হাতে না ছিল টাকা, না কোনো শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। অনেকে বলেছিলেন, 'এই দেশে এসব প্রজেক্ট টিকবে না।' কেউ কেউ আবার আমাকে নিয়ে উপহাস করেছিলেন। কিন্তু থেমে গেলে চলবে না—এই লক্ষ্যে অবিচল ছিলাম। কারণ, থেমে গেলে শুধু আমার স্বপ্ন নয়, যাঁরা আমাকে দেখে অনুপ্রাণিত হতে পারতেন, তাঁদের স্বপ্নও থেমে যাবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, ছোট পরিসরে হলেও একাই ফিলাইটকে বাস্তবে রূপান্তর করব।

নিজ হাতে বানানো প্রোটোটাইপ, জমানো কিছু টাকা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি—এই ছিল আমার সম্পদ। এসব নিয়ে একাই লড়াই শুরু করলাম। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে স্থানীয় কয়েকটি পুকুরে পরীক্ষামূলকভাবে ফিলাইট স্থাপন করি। এর ফলাফল আশার চেয়েও ভালো হলো। কৃষকেরা নিজে থেকেই জানালেন, তাঁদের মাছের উৎপাদন বেড়েছে, বিদ্যুৎ খরচ একেবারেই নেই। রাতে পুকুরে এক সুন্দর আলোর ছটা যেন তাঁদের জীবনে আশার আলো হয়ে এসেছে।

আলোর ঝালর

স্থানীয় কয়েকটি পুকুর পেরিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক পুকুরে ফিলাইট ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা সবে শুরু। কিন্তু জানি, এই শুরুটাই একদিন বড় পরিবর্তনের বীজ বপন করবে। আমার লক্ষ্য হচ্ছে, দেশের প্রত্যেক মৎস্যচাষি যেন কম খরচে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের আয় বাড়াতে পারেন।

ফিলাইট তৈরি করতে গিয়ে শুধু যে প্রযুক্তি শিখেছি, তা নয়, শিখেছি সংগ্রামের অর্থও। বুঝেছি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে শুধু নীতি বা বক্তৃতা নয়, প্রয়োজন বাস্তব উদ্ভাবন, যা মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। একজন তরুণ হিসেবে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রজন্মই সেই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

ভাঙতে হবে বৈষম্যের দেয়াল

তবে বাস্তবতা হলো, এই ২০২৫ সালে এসেও গ্রামের তরুণদের সামনে চলার পথ এখনো কঠিন। শহরের তরুণেরা যেখানে সহজে তহবিল, প্রশিক্ষণ বা পরামর্শ পান, গ্রামের তরুণদের সেই সুযোগ পেতে হয় অনেক বাধা পেরিয়ে। এই সুযোগের বৈষম্যই আমাদের দেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা।

এই বাধা দূর করতে অর্থ কিংবা সুযোগ—যেকোনো বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে ফেলতে হবে। সবাইকে দিতে হবে সমান সুযোগ। শিক্ষা, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন আর তহবিলের সুযোগ যেন শহর ছাড়িয়ে গ্রাম পর্যন্ত সমানভাবে পৌঁছায়। গ্রামের একজন তরুণও যেন নিজের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।

তারুণ্যের জয় মানে শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটা সমাজের পরিবর্তনের প্রতীক। স্বপ্ন দেখি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে এমন একটি বাংলাদেশ তৈরি করা সম্ভব, যেখানে শহর আর গ্রামের ব্যবধান কমে আসবে, যেখানে একজন কৃষকও ডিজিটাল সমাধান ব্যবহার করে নিজের আয় দ্বিগুণ করতে পারবেন, আর যেখানে তরুণদের আইডিয়া থেকেই জন্ম নেবে দেশের অগ্রযাত্রা। ফিলাইট সেই স্বপ্নেরই একটি অংশ; বৈষম্যের অন্ধকার ঘোচানোর বাতি।

সহযোগিতার নতুন ইকোসিস্টেম দরকার

প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন দেশের প্রত্যেক মানুষ পরিবর্তনের যাত্রায় অংশ নিতে পারেন। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে শুধু কিছু মানুষের উদ্ভাবন বা সাফল্যই যথেষ্ট নয়, দরকার একটি সহযোগিতামূলক ইকোসিস্টেম—যেখানে সরকার, বেসরকারি খাত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তরুণ উদ্যোক্তারা একসঙ্গে কাজ করবেন।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেও উন্নয়ন সম্ভব। প্রয়োজন শুধু সচেতনতা ও কার্যকর উদ্যোগ। উদ্ভাবনের সঙ্গে যদি টেকসই উন্নয়ন যুক্ত করা যায়, তাহলে আমরা এমন এক বাংলাদেশ গড়তে পারব, যেখানে উন্নয়ন আর পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক হবে। ফিলাইট মূলত তারই উদাহরণ, প্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়নের এক চমৎকার সমন্বয়।

তরুণদের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে তাঁরা নতুন কিছু ভাবতে পারবেন, ঝুঁকি নিতে পারবেন, ব্যর্থ হলেও সুযোগ পাবেন আবার উঠে দাঁড়ানোর। শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবন, গবেষণা এবং বাস্তব প্রয়োগের ওপর আরও বেশি জোর দিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, যেদিন দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের একজন তরুণও শহরের তরুণের মতো সমান সুযোগ পাবেন, সেদিনই সত্যিকারের বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

আমার লক্ষ্য, একদিন যেন বাংলাদেশের প্রতিটি পুকুরে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি ঘরে ফিলাইটের আলো জ্বলে ওঠে। কারণ, জানি, যত দিন তরুণেরা স্বপ্ন দেখেন, তত দিন অন্ধকার স্থায়ী হতে পারে না।

সাফল্য

মাত্র দেড় বছরে ফিলাইটের অর্জন অনেক। ফিলাইট উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছি। 'স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন ২০২৫' সম্মাননা, 'সিমকিউবেটর বুটক্যাম্প' জয়, 'সাসটেইনলঞ্চ ল্যাব'-এ প্রথম রানারআপ এবং 'স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৫'-এর শীর্ষ প্রতিযোগী—সবই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু জানি, এই পুরস্কারের চেয়েও বড় হলো 'প্রভাব' অর্থাৎ একটা বাস্তব পরিবর্তন, যা মানুষের জীবনে ঘটে।

তবে আমার কাছে পুরস্কারের চেয়েও বড় হলো সেই কৃষকের কণ্ঠ, যিনি ফোন করে বলেন, 'ভাই, পুকুরে আপনার ফিলাইট দিলে মাছ ভালো বাড়ছে।'

এই একটি বাক্যের ভেতরে লুকিয়ে থাকে আমার সব পরিশ্রমের সার্থকতা। বর্তমানে এই প্রকল্পকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। আলো যেন আরও উজ্জ্বল হয়, ব্যাটারির ব্যাকআপ আরও দীর্ঘস্থায়ী হয় আর দামটা আরও কমানো যায়, যেন সবার পক্ষে ফিলাইট কেনা ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

লংকাবাংলা™ ফাইন্যান্স

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে
অর্থপূর্ণ অগ্রযাত্রায় একসাথে

সত্যে তথ্যে চিরন্তন এই যাত্রায় দৈনিক
প্রথম আলো
২৭তম বর্ষপূর্তিতে সাফল্যের নতুন পথচলায়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভক্ষণে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিবাদন।

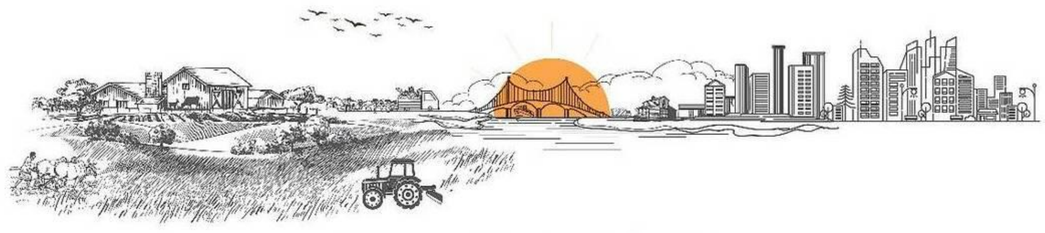

আমাদের প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও

রিটেইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবাসমূহ
রিটেইল ডিপোজিট স্কিমস
লোন
অটো লোন
হোম ও মর্টগেজ লোন
পার্সোনাল লোন
ক্রেডিট কার্ডস
ভিসা
মাস্টারকার্ড

মাছলি ডিপোজিট স্কিমস
ফ্লেক্সি ডিপোজিট
মানি বিল্ডার
কুইক সঞ্চয়

বিশেষায়িত ডিপোজিট স্কিমস
অগ্রজ
স্বস্তি
প্রতিভা

কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল সেবাসমূহ
লার্জ কর্পোরেট
ইমার্জিং কর্পোরেট
প্রজেক্ট, স্ট্রাকচার্ড ও সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স
কর্পোরেট লায়াবিলিটি

সিএমএসএমই ফাইন্যান্সিয়াল সেবাসমূহ
সিএমএসএমই ডিপোজিট স্কিমস
কুটির ও মাইক্রো ব্যবসায় লোন
ক্ষুদ্র ব্যবসায় লোন
মিডিয়াম ও ইমার্জিং ব্যবসায় লোন
সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স

মেয়াদি ডিপোজিট স্কিমস
আর্ন ফার্স্ট
ক্লাসিক টিডিআর
সহজ সঞ্চয়
ডাবল মানি
ট্রিপল মানি

শিখা ডিপোজিট স্কিমস
শিখা ইচ্ছে
শিখা অবিরত
শিখা সঞ্চয়
শিখা প্রজ্বলন

শিখা ফাইন্যান্সিয়াল সেবাসমূহ
শিখা রিটেইল ডিপোজিট স্কিমস
শিখা সিএমএসএমই ডিপোজিট
শিখা সিএমএসএমই লোন
শিখা ক্রেডিট কার্ড (মাস্টারকার্ড)

বিস্তারিত জানতে ১৬৩২৫
PCI DSS Compliant ISO 27001 : 2022 Certified
www.lankabangla.com

ঢালাই স্পেশাল সিমেন্ট

MGI 50 Years

ঢালাই এখন
স্মার্ট BOPP ব্যাগ-এ

- আর্দ্রতা-প্রতিরোধী
- সহজে পরিবহনযোগ্য
- সিমেন্টের মান সংরক্ষণে এক্সপার্ট
- কর্মক্ষেত্রে নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা

Call us at 16595
dhalaispecialcement

বাড়ন্ত শহরে কোণঠাসা শৈশব-কৈশোর

আকতার মাহমুদ

নগর-পরিকল্পনাবিদ ও অধ্যাপক,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শহরের একটি শান্ত সকাল। এমন সকালে প্রশস্ত, ছায়াঢাকা ফুটপাত ধরে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে দুই ভাইবোন। তারা হাঁটছে হাত-ধরাধরি করে। এমন একটা দৃশ্যের কথা ভাবুন তো। কী সুন্দর ছবি! প্রতিটি পরিবারে কিছু সুখের ছবি থাকে। ঠিক তেমনই এই ছবিও একটি নগরের সুখের ছবি।

শহরের এমন একটি ছবি তৈরি করতে অনেক নগরচিন্তক, নগরকারিগর ও প্রতিষ্ঠানকে চিন্তাশীল অবদান রাখতে হয়। শহরের দীর্ঘমেয়াদি সঠিক পরিকল্পনার চর্চা, সে অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়ন, নিরাপত্তা—সব মিলিয়ে এমন দৃশ্য তৈরি হয়। আর আমার কাছে শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে মানুষ এবং তার জন্য গণপরিসর সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা।

গণপরিসর ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো নগরে শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। খেলার মাঠ, উদ্যান, জলাশয়, নদী, নির্মল বাতাস, সবুজ বনানী, নিরাপদ ফুটপাত—একটি নগরের গণপরিসর ও স্বাস্থ্য অবকাঠামোর অংশ। এসবই নগরের প্রাণ।

সফল শহরের সার্থকতা নির্ভর করে এর গণপরিসর কতটা উন্মুক্ত, কতটা সুন্দর করে ব্যবহার করা হয় এবং শহর কর্তৃপক্ষ কতটা সুন্দরভাবে তা গুছিয়ে রাখতে পারে, তার ওপর। নগরজীবনে গণপরিসরকে এমনভাবে বিন্যাস করা উচিত, যাতে মানুষে মানুষে অর্থপূর্ণভাবে দেখা করা, কথা বলা এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে।

আমাদের দেশের নগরগুলোয় সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন এবং সুশাসনের অভাবে শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যায়নি। দেশের গণপরিসর উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ধরন খেয়াল করলে দেখা যাবে, এখানে নগরের প্রায় সব পরিসরেই ক্ষমতাবান, সক্ষম ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির অভিপ্রায় প্রাধান্য পেয়েছে।

নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের উপযোগী শহর এ দেশে তৈরি হয়নি। এখানে মালিকানাবিহীন যৌথ পরিসর ব্যবহারের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দর্শন সংকুচিত হয়েছে। এ কারণে আমাদের শহরাঞ্চলে নগরজীবন কখনো আরামদায়ক হয়ে গড়ে ওঠেনি। নগরে বসবাসকারী মানুষের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল আচরণ না দেখালে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর কোনো দিন নিশ্চিত করা যাবে না।

স্বাস্থ্য অবকাঠামো

গণপরিসরের উপাদানগুলো সরাসরি জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এই উপাদানকে আমরা স্বাস্থ্য অবকাঠামো বলি। এর মধ্যে উদ্যান বা পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ যেমন আছে, তেমনি আছে নদী, লেকসহ বিভিন্ন জলাশয়, সবুজ বনানী ও রাস্তাঘাট।

রাস্তা ও এর দুই পাশের ফুটপাত নগরজীবনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ গণপরিসর। এ ছাড়া স্টেডিয়াম, ব্যায়ামাগার, কমিউনিটি স্পেস, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, কমিউনিটি লাইব্রেরি, নদীর তীর, খোলা প্রান্তরকে গণপরিসরের অংশ হিসেবে ধরা হয়।

নিরাপদ ও প্রশস্ত খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থান শিশু-কিশোরদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তেমনই নারী ও বয়স্ক মানুষসহ সবার জন্য পার্ক বা উদ্যান প্রয়োজন।

আমাদের ছোটবেলায় মাঠ ছাড়া একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও কল্পনা করা যেত না। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাড়া, মহল্লা বা ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ থাকা দরকার। নগরে খোলা আকাশের নিচে দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। খেলাধুলা, বিতর্ক, বিজ্ঞান মেলা, স্কাউটিং ইত্যাদি সহশিক্ষা কার্যক্রম স্কুলের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

শহরে পর্যাপ্ত সবুজ পরিবেশ ও জলাশয়ের ব্যবস্থা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ ঘটায়। লাইব্রেরি, শিশু-কিশোর ক্লাব, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আর্ট ও ক্র্যাফট কর্মশালা, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিশু-কিশোরদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

উন্মুক্ত স্থানের প্রয়োজনীয়তা

একটি মাঠ বা উন্মুক্ত স্থান শুধু খেলার জন্য নয়। এখানে বড়রা সকাল-বিকেল হাঁটাহাঁটি করতে পারেন। কোথাও কোথাও তা ঈদগাহ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আধুনিক নগর-পরিকল্পনায় এসব জরুরি। কারণ, দুর্যোগে জরুরি প্রয়োজনেও কাজে আসে। জনস্বাস্থ্য, সামাজিকতা, পরিবেশ ও অর্থনীতিতে গণপরিসর ও উন্মুক্ত স্থানের গুরুত্ব অনেক।

গণপরিসর ও স্বাস্থ্য অবকাঠামোর অভাব নগরের শিশু-কিশোরদের শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, বরং তাদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ, সামাজিক কাঠামো এবং জাতীয় উন্নয়নকেও গভীরভাবে বিপন্ন করছে। এ সমস্যা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে একটি দুর্বল, মানসিকভাবে অসুস্থ ও অনিরাপদ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করা হবে।

রাজধানীর লক্ষ্মীবাজারের এই ছবি *প্রথম আলোয়* ছাপা হয় ২০২২ সালে। পরে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের সামনে থেকে শিশুদের খেলাধুলার স্থাপনা সরানো হয়েছে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

শারীরিক ও মানসিক বিকাশে প্রভাব

নগরে গণপরিসর ও স্বাস্থ্য অবকাঠামোর ঘাটতি শিশু-কিশোরদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আচরণগত বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মাঠ বা পার্ক না থাকায় খেলাধুলা, দৌড়ানো, লাফানো ও শরীরচর্চার সুযোগ থাকে না। এতে শিশু-কিশোরদের মধ্যে শারীরিক ফিটনেসের অভাব, উদ্যমে ঘাটতি, পেশি দুর্বলতা, স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে মুঠোফোন ও অন্যান্য গ্যাজেটে আসক্তিসহ স্ক্রিনটাইম বেড়ে যাচ্ছে।

> নগর-পরিকল্পনার ভাষায় আমরা বলি, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ১৫ মিনিট হাঁটা দূরত্বে যেন একটি খেলার মাঠ অথবা পার্কের মতো একটি গণপরিসর পেয়ে যান।

উন্মুক্ত স্থান ও সবুজ এলাকা না থাকলে বাতাস ভারী হয়। হাঁপানি, অ্যালার্জি বাড়ে ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে। উন্মুক্ত স্থান না থাকলে হাঁটাহাঁটি ও ব্যায়ামের অভাবে ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক, ক্যানসার ও মুটিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। খোলা বাতাস ও সবুজের মধ্যে সময় কাটানোর সুযোগ না থাকলে শিশু-কিশোরদের মানসিক চাপ, হতাশা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। এতে অপরাধপ্রবণতাও বাড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলি বিকাশে বাধাগ্রস্ত করে।

খেলার মাঠ না থাকলে অন্য শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয় না। দলগত খেলার সুযোগের অভাবে নেতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদির মতো ইতিবাচক দিকগুলোর বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। মুক্তচিন্তা, সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তি বাধাগ্রস্ত হয় এবং শিশু-কিশোরদের আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে।

নগর-পরিকল্পনার সূচকে গণপরিসর

নগর-পরিকল্পনার ভাষায় আমরা বলি, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ১৫ মিনিট হাঁটা দূরত্বে যেন একটি খেলার মাঠ অথবা পার্কের মতো একটি গণপরিসর পেয়ে যান। আবার পাড়া-মহল্লাগুলোয় এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেন শিশু-কিশোরেরা ছয় থেকে সাত মিনিট হাঁটা দূরত্বে একটা খেলার জায়গা পেয়ে যায়। এতে অনেক বড় জায়গা প্রয়োজন হয় না। একে বলে 'প্লেয়িং লট'।

কমিউনিটি স্পেস বা নেইবারহুড মাঠের জন্য একটু বড়, অর্থাৎ ৫ থেকে ১০ একর জায়গার দরকার হবে। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় প্লেয়িং লট, মিনি পার্ক, নেইবারহুড পার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের গণপরিসর থাকা দরকার। মেট্রোপলিটন পর্যায়ে পার্ক তৈরিতে আরও অনেক বড় জায়গার দরকার হয়, যেমন আমাদের রমনা উদ্যান। আগের ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে সাড়ে ১২ হাজার মানুষের জন্য তিনটি খেলার মাঠের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, প্রত্যেক মানুষের জন্য শহরে কমপক্ষে ৯ বর্গমিটার করে সবুজ খোলা পরিসর থাকা প্রয়োজন। আর আমরা হিসাব করে দেখেছি, ঢাকায় এই তুলনায় মাত্র ৯০ ভাগের এক ভাগ উন্মুক্ত পরিসর আছে।

ঢাকা শহরের উন্মুক্ত স্থান কখনো ক্লাব দখল করে রাখে, কখনো চলমান প্রকল্পের নির্মাণসামগ্রী রেখে বন্ধ করে ফেলা হয়। ঢাকার ফার্মগেটের আনোয়ারা উদ্যান, বাংলামোটরে পান্থকুঞ্জ উদ্যান গত কয়েক বছরে সরকারি প্রকল্পের কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও রমনা উদ্যানের অবস্থাও করুণ।

উত্তরা, গুলশান ও বনানীর মতো পরিকল্পিত আবাসিক এলাকায়ও পার্কের জায়গা প্লটে রূপান্তর করা হয়েছে। কোনো কোনো খেলার মাঠ ও উদ্যান সবার জন্য উন্মুক্ত নয়।

সংরক্ষণে উদ্যোগ

উন্নত বিশ্বের অনেক বড় শহরে 'ওপেন স্পেস অথরিটি' নামে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। আর আমাদের দেশে উদ্যান, খেলার মাঠ ইত্যাদি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিটি করপোরেশনকে। এসব স্থানের জমি হয় ব্যক্তিমালিকানায় আছে, নয়তো দখল করা হচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে উদ্যোগ না নিলে এ ধরনের গণপরিসর সৃষ্টি করা যাবে না। কারণ, নগরায়ণের তালে জমির দাম বেড়ে যায়। তখন এটা কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে উন্মুক্ত স্থান ও খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিলে এ অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর যদি তাঁর মেয়াদে ওয়ার্ডে একটা করে উদ্যান বা খেলার মাঠ তৈরি করেন, তাহলে ঢাকায় প্রতি পাঁচ বছরে নতুন করে ১২৯টি গণপরিসর তৈরি করা যেতে পারে।

নগর-পরিকল্পনাবিদেরা মনে করেন, দ্রুত এ ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। হাজার-কোটি টাকা খরচ করে অবকাঠামো, আবাসিক এলাকা তৈরি করি, কিন্তু নতুন গণপরিসর তৈরি করতে কেন অর্থের সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকবে না?

সুস্থ প্রজন্ম, মানবিক নগর

শিশু-কিশোরদের সুস্থ শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করতে নগর-পরিকল্পনায় সমন্বিত সুবিধা থাকা জরুরি।

একটি নগর মানে তো শুধু সুউচ্চ দালান আর রাস্তা নয়। এটা শিশু-কিশোরদের জন্য খেলাধুলা, শিক্ষা, সৃজনশীলতাসহ সবার শিক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চা, বিনোদনের জায়গা, একটা মানবিক শহর। সুস্থ প্রজন্ম গঠনের জন্য এটি শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, টেকসই নগর উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। মানবিক শহর গড়ে তুলতে মানসম্পন্ন সুন্দর গণপরিসরের বিকল্প নেই।

নগর-পরিকল্পনায় শিশু-কিশোরদের জন্য গণপরিসর ও স্বাস্থ্য অবকাঠামোকে বিলাসিতা নয়, অপরিহার্য বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

নিজেদের স্বপ্নে থাকুক অন্যের ভাগ

আরিয়ান আরিফ

প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, মজার ইশকুল

বাংলাদেশের প্রতিটি বড় পরিবর্তনের পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে তারুণ্য। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র আদায়ের আন্দোলন থেকে প্রযুক্তির বিপ্লব—সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রে ছিল তরুণেরা।

আজকের তরুণ প্রজন্মও এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে। তবে এবার শত্রু অদৃশ্য। তার নাম বৈষম্য। আমি নিজেও সেই লড়াইয়ের একজন যোদ্ধা। 'মজার ইশকুল'-এর মাধ্যমে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমার এই লড়াই চলছে। মজার ইশকুল শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, একটি আন্দোলন। যার বিশ্বাস—শিক্ষা বিলাসিতা নয়, জন্মগত অধিকার।

বৈষম্যের দেয়ালে তারুণ্যের ধাক্কা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, এখনো দেশের প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। আর ইউনিসেফের (জাতিসংঘ জরুরি শিশু তহবিল) ২০২৪ সালের প্রতিবেদন বলছে, ৩৪ লাখের বেশি শিশু বাস করছে অভিভাবকহীন, ছিন্নমূল। রাস্তায় প্রতিদিন প্রায় চার লাখ শিশু বিভিন্ন কাজে যুক্ত, যাদের অনেকেই কখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়নি।

একদিকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ক্লাসরুমে ল্যাপটপ হাতে শিশু, অন্যদিকে ফুটপাতে খালি পায়ে অবহেলিত শিশু—এই ফারাকই আমাদের সমাজে বৈষম্যের সবচেয়ে দৃশ্যমান চিত্র।

এই বাস্তবতা প্রতিদিনের। রোজ দেখি, কোনো শিশুর চোখে ক্ষুধা, আবার কারও চোখে স্বপ্ন। তবু জানি, তারুণ্যের শক্তি যদি এই বৈষম্যের দেয়ালে ধাক্কা দেয়, তাহলে তা ভাঙবেই।

মজার ইশকুল—পথ থেকে শ্রেণিকক্ষে

২০১৩ সালে আমার বয়স ছিল ২১ বছর, পড়ছি অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। তখনই শুরু করি 'মজার ইশকুল'। ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, খোলা আকাশের নিচে শুরু হয় এই ইশকুলের যাত্রা। লক্ষ্য ছিল পথশিশুমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

এই স্বপ্নের অনুপ্রেরণা এসেছে মুক্তিযুদ্ধের গেরিলাযোদ্ধা শহীদ শাফী ইমাম রুমীর কাছ থেকে। যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে দ্বিধা করেননি। রুমী শিখিয়েছেন, দেশপ্রেম মানে শুধু যুদ্ধে অস্ত্র ধরা নয়, মানুষের জীবনে আলো আনার লড়াইও একধরনের মুক্তিযুদ্ধ।

মাথার ওপর খোলা আকাশ, মাত্র ১৩টি শিশু আর কিছু রংপেনসিল—এই নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল মজার ইশকুল। আজ তা একটি পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে; যেখানে শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও ডিজিটাল লার্নিং—সব একসঙ্গে চলছে।

প্রায় ১৩ বছরের যাত্রায় মজার ইশকুলের এখন ২৩টি শাখা। নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ৩০০ আর নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী ৮ হাজার।

মজার ইশকুলের সবচেয়ে বড় শক্তি দেশব্যাপী তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা। যাঁরা প্রতিদিন নিজের সময়, শ্রম আর ভালোবাসা দিয়ে পরিবর্তনের এই কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন। তাঁদের কেউ পড়ান, কেউ শিশুদের জন্য খাবার রান্না করেন, কেউ-বা শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন—সবাই মিলে এ এক মানবিক পরিবার। তরুণেরাই এই পরিবারের প্রাণশক্তি।

তাঁদের কাজ প্রমাণ করে দিয়েছে, তারুণ্যের জয় মানে শুধু নিজের ভবিষ্যৎ গড়া নয়, বরং অন্যের জীবনেও আলো ছড়ানো।

মজার ইশকুলের মূল লক্ষ্য খাদ্য, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে শিশুদের এসনভাবে গড়ে তোলা, যেন তারা একদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এই পরিবর্তনই হবে আমাদের কাছে সত্যিকারের তারুণ্যের জয়; যেখানে মানবিকতা আর উন্নয়ন হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলবে।

নীতির সঙ্গে কাজের সংযোগ

নীতিগত পরিবর্তন কীভাবে দীর্ঘ মেয়াদে প্রজন্ম বদলে দিতে পারে, তা করে দেখিয়েছে বিশ্বে শিশু অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ 'সেভ দ্য চিলড্রেন'। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা ১৯২৪ সালে বিশ্বের প্রথম শিশু অধিকার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে, যা পরে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের ভিত্তি হয়। বর্তমানে ১৯৬টি রাষ্ট্রে এটি আইনগতভাবে কার্যকর।

> দেশে এখন ৩৪ লাখের বেশি শিশু ছিন্নমূল। রাস্তায় প্রতিদিন প্রায় চার লাখ শিশু বিভিন্ন কাজে যুক্ত, যাদের অনেকেই কখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়নি।

বাংলাদেশেও ২০১৩ সালের 'চিলড্রেন অ্যাক্ট' ও ২০১৭ সালের 'চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেইন্ট অ্যাক্ট'-এর প্রেক্ষাপটে সেভ দ্য চিলড্রেন শিশু অধিকারভিত্তিক গবেষণা, বাজেট বিশ্লেষণ ও পলিসি অ্যাডভোকেসিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

এই ইতিহাসই আমাদের প্রেরণা। আমরা জানি, পথশিশুমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের লড়াই কোনো একক সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সরকার, নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সংগঠন, করপোরেট খাত এবং তরুণ সমাজ—সবাইকে একই লক্ষ্য ও তথ্যভিত্তিক কাঠামোর ভেতর কাজ করতে হবে। মজার ইশকুল আগামী দশকে নিজেকে সেই নীতি-সহায়ক স্তরে উন্নীত করতে চায়, যেখানে মাঠের অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রভাব ফেলবে।

আমরা চাই শিক্ষা, পুষ্টি, শিশু-সুরক্ষা ও পুনর্বাসন—এই চারটি খাতে আমাদের মাঠের অভিজ্ঞতা সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর নীতিমালায় প্রতিফলিত হোক। মজার ইশকুল সুশীল সমাজ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে 'পথশিশুমুক্ত বাংলাদেশ' গঠনে একটি কার্যকর 'পলিসি ইকোসিস্টেম' তৈরি করতে চায়।

আমরা বিশ্বাস করি, যে রাষ্ট্র শিশুদের জন্য নীতি তৈরি করে এবং তা বাস্তবায়নে সাহস দেখায়, সেই রাষ্ট্রই ভবিষ্যতের জন্য টেকসই রাষ্ট্র। মজার ইশকুল সেই বাস্তবতাকে অনুধাবন ও প্রমাণ করাতে চায়।

রাস্তায় শুরু ভবিষ্যতের পথ

মজার ইশকুলের শিক্ষার্থী কুলসুম খাতুন। ২০১৪ সালে সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। সে সময় ক্লাস হতো খোলা আকাশের নিচে। বর্তমানে সে এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কুলসুম এখন তার পরিবারের সবচেয়ে শিক্ষিত সদস্য। ২০১৭ সালে তার দিনমজুর বাবাকে একটি রিকশার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তিনি এখন রিকশা থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক হয়েছেন; জমি কিনেছেন, ঋণমুক্ত জীবন যাপন করছেন। এটাই টেকসই উন্নয়ন। শিক্ষার আলোয় বদলে গেছে কুলসুমের গোটা পরিবার। আর এসবের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একটাই শক্তি—কুলসুমের পড়াশোনা।

আরেক শিক্ষার্থী সীম প্রায় দৃষ্টিহীন। একসময় মায়ের সঙ্গে ভিক্ষা করত, দিনের আলো আর মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পড়াশোনা করে এখন সে প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষক। নিজের উপার্জনে সংসার চালায়, গান গায়, কবিতা লেখে। সীম এখন জীবনের গান গায়।

কুলসুম আর সীমাদের গল্পই প্রমাণ করে, তারুণ্যের জয় মানে সমাজে আলোর দাগ টেনে দেওয়া। তারা প্রমাণ করেছে, যেখানে সুযোগ দেওয়া হয়, সেখানেই সম্ভাবনা জেগে ওঠে।

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ

আমরা এমন এক বাংলাদেশ কল্পনা করি, যেখানে কোনো শিশু ক্ষুধার কারণে স্কুল কামাই করবে না, যেখানে শিক্ষা হবে আনন্দের, স্বাস্থ্য হবে অধিকার আর কাজ হবে সম্মানের।

এই পরিবর্তনের দায়িত্ব কেবল বাংলাদেশ সরকারের নয়, বরং তরুণদেরও। কারণ, বৈষম্যের দেয়াল ভাঙার জন্য শুধু নীতি নয়, দরকার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সংগঠন আর ভালোবাসা। তারুণ্যের হাত ধরেই গড়ে উঠবে সেই বাংলাদেশ, যেখানে জন্ম নয়, অধিকার নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ।

দেশপ্রেম থাকলে আর সঠিক প্রস্তুতি নিতে পারলে বাংলাদেশের তরুণেরা নিজের ভাগ্য যেমন বদলাতে পারে, তেমনি দেশকেও বদলে দিতে পারে। আমরা যদি নিজেদের স্বপ্নে অন্যের ভাগ রাখি, তবে একদিন আমরাই লিখব নতুন ইতিহাস—একটি বৈষম্যহীন, মানবিক বাংলাদেশের। তারুণ্যের জয় মানে নিজের উত্থান নয়, সবার উত্থান নিশ্চিত করা।

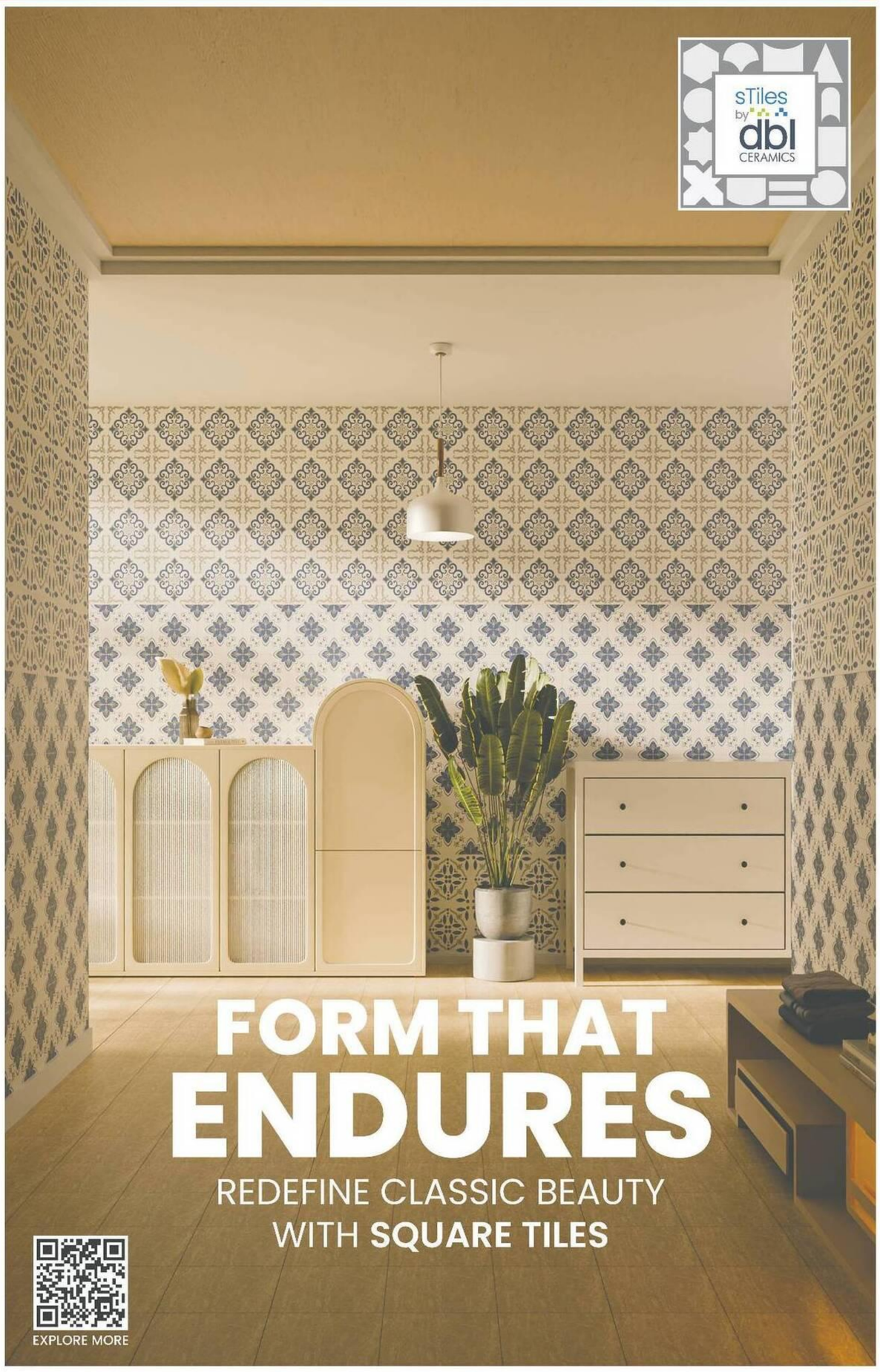

ভাষার ভিন্নতা থেকে জীবনের বৈষম্য

হেমা চাকমা

কার্যনির্বাহী সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ

আমি কেন সঠিক বাংলা বলতে পারি না, এটা কি আমার অপরাধ? ছোটবেলা থেকে নিজেকে এই প্রশ্ন করতে করতে বড় হয়েছি। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, আমার বেড়ে ওঠা যেখানে, তার সাপেক্ষে ভুল হোক আর শুদ্ধ, বাংলা বলতে পারাটাই চমৎকার এক ব্যাপার। বাংলাভাষীরা নতুন কোনো ভাষা শিখতে গিয়ে নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করেন।

কিন্তু শুদ্ধ বাংলা বলতে না পারায় পরবর্তী সময়ে যখন বিভিন্ন সুযোগ থেকে বাদ পড়ে গেলাম, তখন মনে হলো, এটা বৈষম্য। আমিও এই বৈষম্যের শিকার। ভাষাগত কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়া আমাকে কষ্ট দিয়েছে, এখনো দেয়। এই বৈষম্য কেবল ব্যক্তিগত সমস্যা নয়; এটি তারুণ্যের সাফল্যের পথে বাধা।

ভাষা ও পরিচয়ের বৈষম্য

ছোটবেলা থেকেই পাহাড়ি উচ্চারণের কারণে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছি। স্কুলে পড়ার সময় একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলাম। বিচারকেরা আমাকে বারবার 'টাকা' শব্দটি উচ্চারণ করতে বললেন, কিন্তু বারবার আমার উচ্চারণ হতো 'তাকা'।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর, কোন কলেজে পড়েছি প্রশ্ন করা হলে দুবার বলেছি, 'আমি চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজে পড়েছি।' কিন্তু দুবারই শিক্ষক শুনলেন 'চৌদ্দগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ'।

খাগড়াছড়ির পাহাড়ে যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছি, সহজাতভাবে আমার উচ্চারণে সেখানকার ছাপ স্পষ্ট। তবু জোর করে শুদ্ধভাবে বাংলা বলার চেষ্টা করি। নিজের অজান্তেই উচ্চারণের ভুলগুলো হয়। বাংলা 'ট', 'ঠ', 'ত' এবং 'শ', 'ষ', 'স' বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়। কারণ, আমার মায়ের মুখের ভাষার সঙ্গে বাংলার কিছুটা ভিন্নতা আছে। এ কারণে যাঁদের মাতৃভাষা বাংলা, তাঁরা আমাকে দুভাবে বিচার করেন।

প্রথম দলটি ভাবেন, আমি 'খুব কিউট বাংলা' বলি, বিদেশিরা যেমন আধো আধো বাংলা বলে। দ্বিতীয়ত, আমার ভুল বাংলা উচ্চারণ নিয়ে কেউ কেউ কৌতুক ও বিদ্রূপ করেন।

আমার বাড়ি খাগড়াছড়ি; জন্ম চাকমা গোত্রে। আমার নৃতাত্ত্বিক ধরন মঙ্গোলীয়। এই পরিচয়ে তো আমার হাত ছিল না। এরপরও যখন পাহাড় থেকে সমতলে এলাম, তখন এসব বিষয় বাধা হয়ে উঠল। বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার পরও আমার বন্ধু-স্বজন ও আমি 'চায়নিজ', 'চিংচুং', 'গিয়ানমারের লোক', 'আশ্রিত উপজাতি' ইত্যাদি বিদ্রূপের শিকার হয়েছি।

পাহাড় থেকে যখন কেউ ঢাকায় প্রথম আসে বা পাহাড়ে কোনো ঘটনা ঘটে, তখন এসব বিদ্রূপ অনেক বেড়ে যায়। এর ফল হিসেবে দেশের সংখ্যালঘু বিভিন্ন জাতির অধিকাংশ মানুষ বড় শহরে এসেও নিজেদের ছোট গণ্ডিতে রাখেন। মানুষ হিসেবে নিজের অসীম সম্ভাবনাকে চাপা দিতে বাধ্য হন।

পাহাড়-সমতলে শিক্ষার অসমতা

সমতলের মতো পাহাড়ে উচ্চশিক্ষার সমান সুযোগ নেই। স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো পার্বত্য জেলা বান্দরবানের খুমি জাতির কেউ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এই ২০২৫ সালে এসে খুমি জাতির প্রথম নারী শিক্ষার্থী শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। একই সঙ্গে সমতলের সাঁওতাল, ওঁরাও এবং গারোদের মধ্যেও শিক্ষার এই বৈষম্য আছে।

> অনেকেই ভাবেন, এসব বৈষম্য হয়তো সমাজে স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু এসব স্বাভাবিকভাবে হয় না, বরং হতে দেওয়া হয়।

পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষদের ঢাকায় বা চট্টগ্রামে আসতে বাধ্য হতে হয় উচ্চশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য। সমান পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও এখানে তাঁদের নারী-পুরুষ বৈষম্য, সামাজিক বিদ্রূপ এবং নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

নারী পরিচয় ও সামাজিক বৈষম্য

পাহাড়ের ঐতিহ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারী-পুরুষ বৈষম্যের পরিমাণ কম। এমন একটা পরিবেশে বেড়ে ওঠা আমি ঢাকায় এসে দেখেছি, নারী পরিচয়টা এখানে আলাদা। শুধু নারী হওয়ার কারণে নানা ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি হয়; রাতে বের হলে ধর্ষণের শিকার হওয়ার ভয় থাকে। পাশাপাশি সামাজিক নানা বিদ্রূপ তো আছেই।

এসব কারণে যখন বিভিন্ন প্রকল্প, এনজিও, আত্মোন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিই, তখন দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে গালাগালি, নোংরা ও অশালীন মন্তব্য এবং সাইবার বুলিং—এসবের শিকার আমাকে হতে হয়েছে। শুধু নারী হওয়ার কারণে আমাকে এসবের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও স্বপ্নের সংঘাত

আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে অর্থনৈতিক সংকটে। আদতে এই অর্থনৈতিক সংকট আমাদের অধিকাংশ মানুষকেই বৈষম্যের মধ্যে রেখেছে। আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাইনি। এরপরও পড়াশোনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আসতে পেরেছি অনেক মানুষের সহায়তার কারণে। জীবনে একটু এগোনোর জন্য এখনো অর্থনৈতিকভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছি।

কিন্তু চারপাশে তাকালে স্পষ্ট দেখি, আমার মতো হাজারো তরুণ-তরুণী দুর্বল অর্থনৈতিক বাস্তবতায় তাঁদের জীবনের অসীম সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলছেন।

রাষ্ট্র যদি প্রত্যেকের জন্য মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করত, তাহলে এই তরুণ প্রজন্ম দেশের জন্য আরও বেশি অবদান রাখতে পারত। এত স্বপ্নের অকালমৃত্যু হতো না, যা আমাদের রাষ্ট্রের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে।

সমাজব্যবস্থায় বৈষম্য

মানুষ হিসেবে আমি অনেক দূর এগোতে চাই। দেশের অন্য সব নাগরিকের মতো আমার সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকাশের চেষ্টা করতে চাই। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে যেসব বৈষম্য আমাদের সঙ্গে হচ্ছে, সেসব আমাদের নাগরিক হিসেবে পিছিয়ে দিচ্ছে।

তুমি যদি দেখতে আলাদা হও, অন্যদের মতো না হও, যদি পাহাড়ে জন্ম হয় তোমার, যদি দরিদ্র হও তুমি, তোমার সঙ্গে যদি অন্যদের মতের মিল না হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হচ্ছে তুমি অস্বাভাবিক; তোমার সঙ্গে বৈষম্য হওয়া স্বাভাবিক—আমাদের জীবন যেন এই চক্রে আটকা পড়ে গেছে।

অনেকেই ভাবেন, এসব বৈষম্য হয়তো সমাজে স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু এসব স্বাভাবিকভাবে হয় না, বরং হতে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ যদি সব নাগরিকের জন্য সংবিধান অনুযায়ী সমমর্যাদা ও জীবনের সমান নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইত, তাহলে অবশ্যই তার প্রভাব সমাজে দেখতে পাওয়া যেত। অথচ রাষ্ট্রের মূল কাজ এটা। বিশেষ করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশের মানুষের চাওয়া ছিল রাষ্ট্র তার দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করবে।

কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র সবার জন্য সমান মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করছে না। একই সঙ্গে সব নাগরিকের অর্থনৈতিক সাম্য, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকারের সমতাও নিশ্চিত করছে না।

এই যে রাষ্ট্রের উদাসীনতা, এটিই মূলত বিদ্যমান কুসংস্কার, গোষ্ঠীগত আধিপত্য, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা টিকিয়ে রেখেছে।

তবে বিভিন্ন অঙ্গনে বৈষম্য কমানোর বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ দেখা গেলেও কোনো সমন্বিত আন্দোলন চোখে পড়েনি। গণ-অভ্যুত্থানের পর যে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে ছিল, বাংলাদেশ সেই পথে নেই।

যে স্বপ্ন দেখি

বাংলাদেশ রাষ্ট্র একমাত্র তখনই সামনে এগোতে পারবে, যখন আমরা দেশের সব মানুষকে সর্বোচ্চ মানের সচেতন, শিক্ষিত ও মানবিক মানুষ হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করতে পারব।

আমি এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, যেখানে সব মানুষ একে অন্যের প্রতি মমতা ধারণ করবে; সবাই নিজের মতো করে নিজের জীবন গুছিয়ে নিতে পারবে; উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কাজসহ সব মৌলিক অধিকার তার জন্য রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

আমার সব অর্জন নিয়ে আগামী দিনের সুন্দর একটা বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে চাই। নতুন জন্ম নেওয়া একটা শিশুর জন্য নিরাপদ ও সুন্দর বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই।

রাষ্ট্র প্রত্যেকের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করলে তরুণ প্রজন্ম দেশের জন্য আরও বেশি অবদান রাখতে পারে। ছবি : মং হাই সিং মারমা

ক্রোড়পত্র সম্পাদক : আনিসুল হক; সহযোগিতা : মাহফুজ রহমান, সুজন সুপান্থ ও মো. নাজিম উদ্দিন; অঙ্গসজ্জা : আনিসুজ্জামান সোহেল, গ্রাফিকস : আমিনুল ইসলাম